আদিবাসী সংগীত পটভূমি মালদহ



চন্দনা সাহা

1

আদিবাসী সংগীত : পটভূমি মালদহ

(প্রথম খণ্ড)

চন্দনা সাহা

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা : ৭০০০০৯

ADIBASI SANGEET : PATABHUMI MALDAH, (Part-I) An Enhnologic and Aesthetic Study of Tribal Songs of Maldah District and Collection of Songs Thereof, by Chandana Saha, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, May : 2016. ₹ 200.00

প্রথম প্রকাশ
বুদ্ধপূর্ণিমা, ২০১৬

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
ছায়া গ্রাফিক্স
কলকাতা : ৭০০০৫৪

মুদ্রক
শান্তি মুদ্রণ
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-85131-45-5

মূল্য : দুশো টাকা

3

দেবাংশু ও দেবাদিত্যকে

৫

প্রাক্কথন

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা বহুভাষা-ধর্ম-বর্ণবহুল মানুষের আবাসভূমি, বহুজাতি-উপজাতিক বৈচিত্র্যময়তায় সমৃদ্ধ। বিগত কয়েকবৎসর যাবৎ মালদহে বসবাসের সুবাদে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটেছে বহুবার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠকালে 'লোকসাহিত্য'-এর প্রতি উদ্ভুত বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগই যে মালদহ জেলার লোকসমাজ-জীবন তথা সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ও সংগ্রহকার্যের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ সংশ্লিষ্ট। বিশেষত, এই জেলার বিপুল বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যানুসৃত সংস্কৃতি, তাদের সহজ-অনাবিল ও সংহত গোষ্ঠীজীবন, মানবিক ঔদার্য ও উন্নত সমাজভাবনা, স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত ও শিল্পসাহিত্যের ভাণ্ডার যা সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও অত্যন্ত মূল্যবান অথচ দ্রুত ক্রমাবলুপ্তির পথে ধাবমান—সেইসব লুপ্তপ্রায় স্বল্পালোকিত আদিবাসী সংস্কৃতিকে ক্ষেত্রসমীক্ষণ-সংগ্রহকার্যের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি বারবার। ২০১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী মালদহ জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ৩১৩, ৯৮৪ জন। এই বিপুল বৈচিত্র্যময় আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, কোরা, মাহালি, শাওরিয়া পাহাড়ি, মালপাহাড়ি, খাড়িয়া, গোন্দ প্রভৃতি সম্প্রদায়। এরা একদা কর্মসূত্রেই এসেছিল মালদহে, পরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে সাঁওতাল উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিবাসীদের মধ্য থেকে মূলত চার প্রজাতির আদিবাসীকে নির্বাচন করা হয়েছে এই গ্রন্থে—সাঁওতাল, কোরা, মাহালি এবং ওরাওঁ। জেলার প্রায় সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মিললেও মূলত পুরাতন মালদা ব্লক, গাজোল ব্লক, হবিবপুর ব্লক ও রতুয়া ব্লককেই মুখ্য আদিবাসী-প্রবণ এলাকারূপে চিহ্নিত করা হয়। এই চারটি ব্লক থেকেই ক্ষেত্রসমীক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসী-সঙ্গীত তথা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে গানগুলির শ্রেণীকরণ বিষয়ভিত্তিক নয়, মূলত Context-এর উপর গুরুত্ব দিয়েই এই বিভাজন করা হয়েছে। বেশ কিছু গানের আবার সুনির্দিষ্ট Context-নেই, অর্থাৎ জন্ম-বিবাহ-পূজা-পরবে বিভিন্ন অনুষঙ্গেই গাওয়া হয়ে থাকে। সেই বিশিষ্ট গানগুলিকে 'বিবিধ গান' এর অনুর্ভূক্ত করা হয়েছে। আদিবাসীদের পরম ঔদার্য-সৌজন্য ও সাহচর্যে ভাষাগত দূরূহতা অতিক্রম করে তাদের ঐতিহ্যানুসারী সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতিসত্তার গভীর তাৎপর্য-অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে। এপ্রসঙ্গে জ্যোতিষ ওরাওঁ, শ্রীমন্ত ওরাওঁ, চুরকা হাঁসদা, ডমিনিক মার্ডি, কৃষ্ণা মুদি, আরতি মুদি, বাহাদুর মুদি ও নগেন হাঁসদার সক্রিয় সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ক্ষেত্রসমীক্ষণ বিষয়ে সর্বপ্রথম উৎসাহিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয়

শিক্ষাগুরু প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার। তাঁর মূল্যবান নির্দেশ ও পরামর্শই এই সমীক্ষণ কার্যের সঠিক গতিদানের মূলে ক্রিয়াশীল। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। যাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে ক্ষেত্রসমীক্ষণের কাজ এত দ্রুত সম্পন্ন হত না তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ঘোষ। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। বিভিন্ন সময় মূল্যবান নির্দেশ এবং গ্রন্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিকাশ রায়। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বিষয়োপযোগী মূল্যবান গ্রন্থ লাভ করে উপকৃত হয়েছি, ধন্যবাদ গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্মীবৃন্দকে। সর্বোপরি গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে এবং বারবার উৎসাহদানে আমাকে ধন্য করেছেন শ্রীযুক্ত দেবাশিস ভট্টাচার্য। দেবাশিসবাবুকে এবং 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মালদহ
২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬



সূচীপত্র

8

ভূমিকা

অনেক কাল আগে সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরে সাঁওতাল আদিবাসী মেয়েরা তীব্র যন্ত্রণায় একটি গান গাইতেন।

> ধুলোর ঝড় উঠেছে চারিদিকে, কোথাও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঠ ফুটিফাটা, ফসল হয়নি মাঠে। খিদের জ্বালা বড় জ্বালা, জীবন রাখা হল দায়। তাই যেতে হবে কাজের খোঁজে ধানবাদ কিংবা ঝরিয়ায়, খনি আর খাদানের কাজে। আরও দূরে যেতে পারি আসামের চা বাগানে কিংবা বর্ধমানে নাবাল কাজে। শাড়ি দামি গয়না দামি, উঠবে তোমার অঙ্গে,— পিরিত কিন্তু করতে হবে হিন্দু ছেলের সঙ্গে।

গানটির মধ্যে এই আদিবাসী নারী অনেককিছু প্রকাশ করেছেন।

সিপাহি যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষ আক্ষরিক অর্থে গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হল। August 2, 1858, Lord Stanley's India Bill passed, and thereby finis of the East India Co. India a province of the empire of the 'great' Victoria. Notes on Indian History : Karl Marx. Foreign Languages Pub. House. Moscow. 2nd Impression, page 157.

কিছুটা থিতু হয়ে উপনিবেশবাদী বিদেশি শক্তি পরাভূত দেশের সম্পদকে ব্যবহার করতে শুরু করল। একদিকে বিশাল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও অন্যদিকে বিপুল জনসমষ্টির সহজলভ্য শ্রমশক্তি। কাঁচামাল চলে যাচ্ছে স্বদেশে, ফিরে আসছে উপনিবেশে। কয়লা-অভ্র খনি, আকরিক লোহা, চা বাগিচা, পাট-বস্ত্র-এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের প্রসার ঘটতে লাগল। আর এই প্রতিকূল পরিবেশে গরিব ভারতীয়দের জীবন শোষণে জর্জরিত হতে শুরু করল। এসব জানা তথ্য। কম জানা তথ্য হল, এই দুর্বিপাকে আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই বিপন্ন হয়ে উঠল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন বোম্বে ও বাংলায় রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হল। পাশের জমির মাটি কেটে রেলপথ উঁচু করতে হবে। দুপাশে তৈরি হয়ে উঠল রেললাইন বরাবর নয়ানজুলি। দরকার অসংখ্য শ্রমিক যারা হবে অত্যাধিক পরিশ্রমী, দক্ষ, সৎ এবং ভদ্র। পূর্ব ভারতে তখন মানুষ রয়েছেন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ,—সাঁওতাল মুণ্ডা ওরাওঁ ভূমিজ কোড়া মাহালি মালপাহাড়িয়া হো আদিবাসী। এরাই চালান হতে থাকল বিহারের কয়লা-অভ্র খনি, উত্তরবঙ্গ-আসামের চা বাগিচা, সুন্দরবন-মালদা-বীরভূম-মেদিনীপুরের জঙ্গল হাসিল আর হাওড়া থেকে হুগলি-বর্ধমান-বীরভূম-মালদার রেললাইন পাতার কাজে। জন্মস্থান, পরিবেশ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সব বন্ধন ছিন্ন করে পুরুষানুক্রমে দেশান্তরী হওয়া। নতুন 'মানুষ' হিসেবে 'পুনর্জন্ম' ঘটে গেল তাদের।

এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে থেকেই ইংরেজ প্রশাসক, হিন্দু মহাজন ও থানার মহেশ দারোগার মতো পুলিশ যৌথভাবে সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। যারা ছিল কৃষক, তারা জমি হারিয়ে হয়ে গেল খেতমজুর। ধিকিধিকি আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। আদিবাসীরা সবচেয়ে ঘৃণা করত ক্রীতদাসত্বে, পরিশেষে সেই জীবন আর মেনে নিতে পারল না। ধৈর্য্যের সীমা শেষ হল। আর তাই শুরু হল বিশাল এলাকাজুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ। বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল অনেক দিন ধরেই। রাজমহল পাহাড়কে ঘিরে ভাগনাডিহির মাঠ থেকে শেষ আঘাত আছড়ে পড়ল। মাত্র সাত মাস এই চরম গেরিলা যুদ্ধ সক্রিয় ছিল, সিপাহী বিদ্রোহেরও তিন বছর আগে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত। বীভৎস অত্যাচার ও আদিবাসীদের নির্মম হত্যার পরে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হল এই দেশপ্রেমিক লড়াই। এই এলাকার আদিবাসীদের জীবনে শুরু হল দেশান্তরী হওয়া, যার গালভরা নাম 'মাইগ্রেশান'। পাখিরাও পরিযায়ী হয়, শীতের শেষে তারা আদি বাসভূমিতে ফিরেও যায়। কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠী আর স্বভূমিতে কোনও দিন ফিরতে পারেনি। আফ্রিকা মহাদেশের সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলো থেকে লক্ষকোটি আদিবাসী আমেরিকা-পূর্ব-পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যেভাবে নয়া বসত গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল, ভারতের আদিবাসীদের দেশান্তরী হওয়ার ইতিহাসও একই।

প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে যে আদিবাসী গানটির কথা বলেছি, তার মধ্যে এই দেশান্তরী হওয়ার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর এলাকা খরাপ্রবণ। এমনিতেই ফসল হয় কম। কিন্তু বিস্তৃত অরণ্যভূমিতে অরণ্যের সম্পদ ও শিকার সেই অভাব পূরণ করত। কিন্তু অরণ্যের সে অধিকার তখন আর আদি বাসিন্দাদের নেই। প্রায়ই হয় আকাল, ফসলের ঘাটতি। খিদের জ্বালা তীব্রতর হয়। কোথাও বৃষ্টির দেখা নেই। সিং বোঙাও যেন অসহায়। তাই এবার বোধহয় গাঁওদেশ ছেড়ে বেরোতে হবে কাজের সন্ধানে। কুলি-কামিন হয়ে খনিতে-বাগিচায়-মাটি কাটার কাজে কিংবা জঙ্গল কাটতে যেতে হবে। দূরে, আরও দূরে যেতে হবে। উপায় নেই। হয়তো খিদে মিটবে, শাড়ি-গয়নাও অঙ্গে উঠবে। কিন্তু আমাদের সংহত সমাজের নিয়ম-কানুন আজ বজায় রাখা সম্ভব হবে না। সেখানে যে ইজ্জৎ থাকে না।

আদিবাসীদের এই বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায়। বাংলা ভাষায় অতি সামান্য, আর সে গবেষণাও তেমন উচ্চমানের নয়। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষাতেও পরিযায়ী আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের কথাই বেশি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তাদের ঐতিহ্যগত মৌখিক সাহিত্যের দিকটি উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী চন্দনা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই উপেক্ষিত বিষয়টি আলোচনা করেছেন। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের পদ্ধতি প্রয়োগ করে চারটি পরিযায়ী আদিবাসীর মৌখিক ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। মালদা জেলায় বসবাসকারী চারটি অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনজাতির সংগীত দেশান্তরী হওয়ার এতকাল পরেও কী অবস্থায় রয়েছে তার অনুপুঙ্খ পরিচয় রয়েছে এই গবেষণায়। এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক পরিশ্রমী গবেষণা।

মালদা জেলায় নতুন বসতি গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছেন এমন চারটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংগীত বিষয়ে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। সাঁওতাল কোরা ওরাওঁ ও মাহালি আদিবাসী।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। প্রায় সব জেলাতেই এঁরা বাস করেন। এঁরাই শিক্ষায় ও চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রণী। সাঁওতাল আদিবাসী আদি-অস্ট্রাল জনগোষ্ঠী। এঁদের ভাষা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অস্ট্রিক পরিবারের মুণ্ডারি শাখার অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী, অতি প্রাচীন ধর্মগুলির মতোই জড়-উপাসক। পরবর্তীকালে অনেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। আদিতে এঁরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী।

কোড়া আদিবাসীও ছোটনাগপুর এলাকা থেকেই এই রাজ্যে আসতে বাধ্য হয়। খুব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নয়, এই রাজ্যে লক্ষাধিক কোড়া রয়েছেন। এঁরা মুণ্ডাদের একটি শাখা। একসময় মাটি কাটাই ছিল প্রধান উপজীবিকা। চাষবাসের সঙ্গেও যুক্ত। এই রাজ্যে অধিকাংশই খেতমজুর, নিজেদের জমিজিরেত নেই। নিজস্ব ধর্মীর ভাবনা থাকলেও প্রতিবেশীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোড়া আদিবাসী কালী মনসা শিব পুজো বেশি করেন। অবশ্য করমপুজোও অতি জনপ্রিয়।

ওরাওঁ আদিবাসী দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এঁরা একসময় দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা ছিল বলে অনেক নৃবিজ্ঞানীর ধারণা। আবার অনেকে বলেন, রাঁচি এলাকাতেই তাঁদের রয়েছে ঘন বসতি, তাই এই ছোটনাগপুরেই তাঁদের আদি বাস ছিল। এঁদের ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুরুখ ভাষা। তাঁদের আদি দেবতা পৃথিবী ও মানবসমাজের স্রষ্টা ধর্মেশ, সূর্যদেবতা। কৃষিকাজের সঙ্গেই অধিকাংশ যুক্ত। কিন্তু এই রাজ্যে তাঁদের জমি নেই, সকলেই প্রায় খেতমজুর।

ছোটনাগপুরের আদি বাসিন্দা কোড়া। কোড়া আদিবাসী আদি-অস্ট্রাল মুণ্ডাদের একটি শাখা মৌখিক ভাষা মুণ্ডারি। মূল জীবিকা মাটি কাটা। চাষবাসের সঙ্গেও যুক্ত। একসময় আদিবাসী ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রবল ছিল, বর্তমানে হিন্দু দেবদেবীর পুজোই বেশি করেন। পাশাপাশি করমপুজোও করেন।

পশ্চিমবঙ্গে উত্তরবঙ্গেই রয়েছেন সবচেয়ে বেশি মাহালি। চা বাগিচা এলাকায়। মুণ্ডা ওরাওঁ কোল আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গেই এঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বেশি রয়েছে। একসময়ে মাহালিরা বাঁশের কাজে ছিল পরম পারদর্শী। এঁদের একটি শাখা বাঁশফোড় মাহালিরা ঝুড়ি ও বাঁশ দিয়ে অনন্য শিল্প সৃষ্টি করতেন। বিশেষ করে মহিলারা। পাশাপাশি মাহালিরা চাষবাসও করতেন। মুণ্ডাদের একটি শাখা মুণ্ডা মাহালি বলে পরিচিত হয়। আসলে সাঁওতাল মাহালি অস্ট্রো-এশিয়াটিক একটি ভাষা পরিবারের সদস্য।

এই চারটি আদিবাসী গোষ্ঠী প্রতিকূল অর্থনৈতিক কারণে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। মালদা জেলায় এঁদের সাম্প্রতিক অবস্থান নিয়ে এবং তাঁদের সংগীত বিষয়ে গবেষণা করে বর্তমান গ্রন্থকার একটি নতুন দিকের দরজা খুলে দিলেন। মনে করা হয়, জমি হাসিল ও রেল

লাইনে মাটি কাটার কাজ করতে এসে এই চারটি আদিবাসী স্থায়ীভাবে মালদা জেলায় রয়ে গিয়েছেন।

শ্রীমতী চন্দনা চারটি আদিবাসীর নিজস্ব সংগীত সংগ্রহ করেছেন, অনুবাদ করে টীকা যুক্ত করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। কারাম দাসাই বাঁধনা বাহা ঝারনি সহরায় ঝাণ্ডা ঝুমুর প্রভৃতি গান বৃহত্তর সমাজে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে বিপুল পরিশ্রম করেছেন। আমাদেরই প্রতিবেশী এইসব আদিবাসী মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় না জানলে সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বোধহয়, প্রথম এই ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হল। চা বলয়ের সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কাজ হলেও এমন ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা আমার নজরে আসেনি। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই নানান গোষ্ঠীর আদিবাসী রয়েছেন, সেইসব জেলায়ও এ ধরনের কাজ শুরু করা দরকার। পথ দেখালেন এই গ্রন্থকার।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পথ ধরে তিনি গ্রন্থের শুরুতেই জাতিসত্তা ও নান্দনিকতার আলোয় আদিবাসী সংগীত, আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনে প্রথা ও সংস্কার, পূজাপার্বণ ও সংগীত, আদিবাসী সংগীতের বিবর্তন, সংগীতে মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করায় পাঠক আদিবাসী সংগীতের মর্মলোকে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। সুষ্ঠুভাবে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবেন। এ এক দৃষ্টান্তমূলক গবেষণা।

শ্রীমতী চন্দনা সাহা মালদহের ভূমিকন্যা নন। বিবাহসূত্রে এবং জীবিকার কারণে তিনি মালদহের বাসিন্দা। জেলা শহর থেকে শিক্ষকতার সূত্রে দূরের গ্রামে যেতে হয়। দীর্ঘ কয়েক বছরের এই সান্নিধ্য তাঁকে উজ্জীবিত করে এই চার আদিবাসীর সংগীত বিষয়ে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিষয়ে একজন অ-আদিবাসীর গবেষণা করা যে কত দুরূহ তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। শুধু পরিশ্রমী হলেই হয় না, আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে হয়। এই গবেষণা ও সংকলনের গভীরতা অনুভব করলে বোঝা যাবে, গ্রন্থকার কীভাবে এই চারটি আদিবাসী মানুষের কাছের দুহিতা হয়ে উঠেছেন। এ এক বিরল অনুপ্রেরণা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই ব্যতিক্রমী গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও সংগীত-নান্দনিকতার একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হবে বলে আমার প্রত্যয় রয়েছে। গ্রন্থকারকে আন্তরিক অভিনন্দন।

১০.০৫.২০১৬
কলকাতা

প্রথম পর্ব

জাতিসত্তা ও নান্দনিকতার আলোকে আদিবাসী সঙ্গীত

19

15

আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনে প্রথা ও সংস্কার

বাংলায় আদিবাসী-জনজাতি-উপজাতি-বনবাসী-গিরিজন বা কিরাত নামে পরিচিত আদিম অধিবাসীরা ইংরাজীতে 'Tribe' শব্দটির দ্বারা পরিচিত। 'Tribe' শব্দের মূলে রয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Tribus' যার মধ্যে আছে ত্রিধাবিভক্ত গোষ্ঠীর ব্যঞ্জনা। বর্তমানে আমরা 'Tribe' বা আদিবাসী বলতে বুঝি সামাজিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর এদেশের সেইসব প্রাচীন জনগোষ্ঠীকে, যারা আর্যপূর্ব ভারতের বাসিন্দা। মূলত লোকালয় থেকে, শিক্ষিত জনবসতি থেকে বহুদূরে পাহাড়-বনভূমি কিম্বা তৎসংলগ্ন এলাকাতেই তাদের অবস্থান। বর্তমানে নাগরিক সভ্যতা তথা শিল্পের ব্যাপক ও দ্রুততর প্রসারে ততোধিক গতিময়তায় আগ্রাসিত হচ্ছে বনভূমি, সেইসঙ্গে নিশ্চিত অবক্ষয় ও অবলুপ্তির অতলগর্ভে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দীর্ঘলালিত সযত্নরক্ষিত নিজস্ব বিপুল ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, রীতিনীতির ভাণ্ডার এমনকি ভাষা। বনভূমির সন্তান বিভিন্ন প্রজাতির 'আদিবাসী'র প্রতি তথাকথিত সভ্য তথা অভিজাত সম্প্রদায়ের বিপুল অবজ্ঞা ও নেতিবাচক প্রভাবের সর্বনাশা গহ্বর থেকে তাদের সঠিকভাবে রক্ষার সঙ্কল্প ও প্রয়াসের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন আদিবাসীদের পাশাপাশি বর্তমান শিকড়হীন-মূল্যবোধ ও অবক্ষয়িত যুগে লালিত নবপ্রজন্মকেও সাহায্য করবে জীবনের নবপাঠ গ্রহণে তথা আত্মোপলব্ধিতে। এজন্য আদিবাসী সংস্কৃতির বিপুল ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর জাতিসত্তাগত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মোট আটত্রিশ প্রজাতির আদিবাসীর মধ্যে থেকে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত চারপ্রকার আদিবাসীর (সাঁওতাল, কোরা, ওরাওঁ, মাহালি) বহুমাত্রিক বিশ্বাস সংস্কার ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখার মাধ্যমে আমরা চিহ্নিত করব তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের বলয়টিকে।

একদিকে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির সামগ্রিকভাবে উচ্চসংস্কৃতি ও নাগরিক পরিমণ্ডল থেকে দূরবর্তীতায় অবস্থান আবার এককভাবে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পরস্পর থেকে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করছে। ফলে লোকসংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির স্থূল পার্থক্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক তফাৎ। আবার, একই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত সূক্ষ্ম পার্থক্য গড়ে ওঠে অঞ্চলভেদে। এর অন্যতম কারণ হল সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণ। বিমিশ্রণ না ঘটলে একই আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আচরণগত ভেদ দেখা যেত না। কিন্তু কালিক প্রবহমানতায় পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পারস্পরিক প্রভাবে কিংবা অভিজাত আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তাদের রীতিনীতি-সংস্কার-আচারে সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবর্তনশীলতা।

তবে এসমস্ত সত্ত্বেও বলতেই হয় যে আদিবাসী জীবনে ব্যক্তিভাবনা অপেক্ষা গোষ্ঠীভাবনা অনেক বেশি মূল্যবান। এই গোষ্ঠীভাবনার ও গোষ্ঠীগত আচার ব্যবস্থার ভগ্নাবশেষ সাম্প্রতিককালেও তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন অধ্যায়কে ঘিরে বিকশিত হতে দেখা যায়। বিশেষত জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকে ঘিরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত আচার সংস্কার প্রচলিত সেগুলির মধ্যে বাহ্যত কিছু পার্থক্য দেখা দিলেও কিছু অন্তর্লীন মিলও দুর্লক্ষ্য নয়। আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব মূলত এক এবং অভিন্ন ছিল বলেই তাদের আচার-সংস্কারেও তার প্রতিচ্ছায়া মেলে। বিশ্বের লোকমানসের সাদৃশ্যবোধ থেকেই একদা লোককথা সমীক্ষাক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছিল 'ফিনিস্ মেথড', প্রসঙ্গত তা স্মর্তব্য। আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনে প্রচলিত বহুবিধ প্রথার মধ্যে আমরা আলোচনা করব তাদের জন্ম-মৃত্যু এবং বিবাহ কেন্দ্রিক ঐতিহ্যানুসৃত প্রথাগুলি নিয়ে, তাদের অন্তর্লীন সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে। বিশদভাবে আলোচনার পূর্বে সংক্ষিপ্ত দু-চারটি সূত্রে সাদৃশ্যগত দিকটি দেখানো যেতে পারে।

জন্মকেন্দ্রিক প্রথা-সংস্কার

ক. গর্ভবতী নারীকে কয়েকটি নিষেধ বা Taboo মেনে চলতে হয়। যেমন— সন্ধ্যাকালে গৃহের বাইরে অবস্থান, বন্ধনমুক্ত কেশ, শ্মশানযাত্রা, জীবহত্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্মরূপে বিবেচিত।

খ. নবজাতক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবার তথা গ্রামীন স্বগোষ্ঠীভুক্ত সকলের অশৌচ পালনীয়। নির্দিষ্ট দিনে নাপিত দ্বারা সকলে ক্ষৌরকর্মের মাধ্যমে অশৌচমুক্ত হয়।

গ. অশৌচ-ভঙ্গের দিন নবজাতকের নামকরণ হয়।

ঘ. উক্তদিন নবজাতক গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরূপে স্ব-পরিবার ও স্বগোষ্ঠীভুক্ত আত্মীয়-পরিজন ও গ্রামবাসীর দ্বারা স্বীকৃত ও আপ্যায়িত হয়।

বিবাহকেন্দ্রিক প্রথা-সংস্কার

ক. সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।

খ. বর-কন্যার জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ।

গ. সাধারণত বরের মা বিবাহসভায় উপস্থিত থাকে না।

ঘ. গায়ে-হলুদ, সিঁদুর-দান বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ঙ. 'লগ্ন বাঁধা', 'গিরা-বাঁধা' প্রথা সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীতে না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত।

চ. বিবাহে কন্যাপণ প্রচলিত।

ছ. বিধবাবিবাহ ও বিচ্ছেদ পরবর্তী বিবাহ-ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রথা-সংস্কার

ক. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে দাহ ও কবর দুই-ই প্রচলিত।

খ. শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে কবর দেওয়াই নিয়ম।

গ. মৃত ব্যক্তির কবরে তার জীবিতকালীন ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী রাখা হয়।
ঘ. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবারসহ গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেক পরিবার অশুচি হয়।
ঙ. তেরো দিনে অথবা সুবিধানুযায়ী তার আগে-পরে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
চ. শ্রাদ্ধক্রিয়ায় আদিবাসীরা মৃতের আত্মাকে চিরতরে বিদায় গ্রহণের অনুরোধ জানায়।
ছ. আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'আত্মা' সম্পর্কিত ধারণা শ্রাদ্ধক্রিয়ার মধ্যে স্পষ্টতর হয়।
এ বার আমরা সাঁওতাল-কোরা-ওরাওঁ এবং মাহালি উপজাতির মধ্যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্পর্কিত প্রথা ও সংস্কারসমূহকে বিশদরূপে আলোচনা করব।

এক. জন্ম-কেন্দ্রিক প্রথা ও সংস্কারসমূহ

নবজাতক ও গর্ভবতী নারী উভয়কে নিয়েই আদিবাসী সমাজে বেশ কিছু প্রথা-সংস্কার রয়েছে। সন্তানের জন্মলাভের পূর্ব থেকেই গর্ভবতী নারী বেশ কিছু নিষেধ (Taboo) মেনে চলে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সন্ধ্যাকালে গৃহের বাইরে মুক্ত প্রাঙ্গণে বা বৃক্ষতলে অবস্থান, বন্ধনমুক্ত আলুলায়িত কেশ, জীবহত্যা, কাপড় সেলাই করা, শ্মশানযাত্রা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শিশু জন্মলাভের পরবর্তী আচার শুধু 'মা' নয়, ব্যক্তিক গণ্ডী পেরিয়ে সমগ্র পরিবার তথা গ্রামবাসীর পালনীয়। সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং গ্রামীণ স্বগোষ্ঠীভুক্ত নরনারী প্রত্যেকেই অশুচি বলে গণ্য হয় এবং নির্দিষ্ট নির্ধারিত দিনে সকলেই নাপিতের ক্ষৌরকর্ম দ্বারা অশৌচমুক্ত হয়। এই প্রথাগুলি প্রায় সমস্ত আদিবাসী সমাজে প্রচলিত। আরেকটি জনপ্রিয় ক্রীড়াপূর্ণ অনুষ্ঠান হল নবজাতকের নামকরণ। সাধারণত অশৌচভঙ্গের দিন নবজাতকের নামকরণ হয়। ছোটনাগপুরে 'হো' সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতামহের নামানুসারেই জ্যেষ্ঠপুত্রের নামকরণ হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যক্ষেত্রে তারা মটর বা কলাই দানাকে একেকটি নির্বাচিত নাম উচ্চারণের সাথে সাথে জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করে। সেটি জলে ভেসে উঠলে আবার ঐ পদ্ধতিতে বিকল্প নামোচ্চারিত হয়, দানাগুলি ডুবে গেলে সংশ্লিষ্ট নামটি মনোনীত হয়। 'রাভা' সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার অদ্ভুত খেলার প্রচলন রয়েছে। একটি কুক্কুটকে কলার ডাঁটা দিয়ে প্রহার করা হয় প্রত্যেকবার নামোচ্চারণের সময়। কুক্কুটটির প্রাণ-বায়ু নির্গমণের পূর্বে উচ্চারিত নামটি নবজাতকের জন্য ধার্য হয়। এইভাবে একেকটি আদিবাসী গোষ্ঠী বিচিত্র প্রথানুষঙ্গে নামকরণ করে থাকে। এই দিনেই নবজাতক গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরূপে নিজ পরিবার তথা নিজ গ্রামভুক্ত গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে আপ্যায়িত ও আদৃত হয়ে থাকে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু জন্মের পর সমগ্র গ্রামবাসীকে অর্থাৎ স্বগোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীদেরকে গোডেত বা গৃহকর্তা খবর দিয়ে আমন্ত্রণ জানায়। সেদিনই নবজাতককে স্বগোত্রে অন্তর্ভূক্ত করে নামকরণ হয়। গ্রামবাসী সংশ্লিষ্ট গৃহে উপস্থিত হলে অশৌচভঙ্গের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে নাপিত নবজাতকের মস্তকমুন্ডন করে, উপস্থিত সকলের ক্ষৌরকর্মের মাধ্যমে মূল ক্রিয়াকান্ডের সূচনা করে। এরপর সাঁওতাল নরনারী পৃথক পুকুরে বা জলাশয়ে স্নানকর্ম সমাধা করে ফিরে আসে। এদিকে নবজাতকের গৃহে চলে

'নিম্-দা-মাণ্ডি' রন্ধনক্রিয়া। 'নিম্-দা-মাণ্ডি' হল নিমপাতা সহযোগে প্রস্তুত আতপ চালের ভাত। স্নানান্তে প্রত্যাগত প্রত্যেক নরনারী অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই বিশেষ অন্ন ভোজন করে। ভোজনপর্বের আগে অবশ্য 'দারকিন্‌বুড়ি' অর্থাৎ ধাইমা পরিবারের সকলের সাথে পরামর্শ করে নিয়ে উপস্থিত গ্রামবাসীকে জানাবে শিশু কার নাম পেল। নবজাতকের নাভিচ্ছেদনের পরেই নামকরণ মোটামুটি স্থির হয়ে যায়। নবজাতকের নতুন নামকরণ হয় না। সাধারণত পূর্বপুরুষ যেমন ঠাকুরদা, জ্যেঠা, কাকার নাম সে পায়, অধিক সন্তান হলে মাতৃকুলের মাতুল, ঠাকুরদার নাম রাখা হয়। নবজাতিকার ক্ষেত্রেও সমরীতি অনুসৃত হয় অর্থাৎ ঠাকুরমা, দিদা, মাসি প্রভৃতির নাম পায় তারা। এটিই নবজাতক বা জাতিকার মূলনাম বা 'গড়ম্'। মূল নামকরণের পর তাদেরকে পৃথক একটি সৌখিন বা আধুনিক নাম ইচ্ছেমত রাখা হয়। এরপরে আরেকটি অনুষ্ঠান জন্মকে ঘিরে পালন করা হয়, সেটি হল 'ছাটিহার'। তবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট দিন বা সময়ক্রম নেই। শিশুজন্মের পর যেকোনো দিন এমনকি বিবাহের পূর্বেও করা যায়, তবে এই ছাটিহার পালন না করলে বিবাহ ক্রিয়া হবে না। এই অনুষ্ঠানে মারাংবুরুর নামে পচানি উৎসর্গ করে সমস্ত গ্রামবাসীকে খাওয়ানো হয়। ছাটিহার বলতে তারা বোঝে 'দীক্ষা'কে। নবজাতককে মস্তকমুন্ডন করানো হয়। বিবাহের সময় হলে ক্ষুর স্পর্শ করানো হয় মাত্র, বাকী গ্রামবাসীরাও ক্ষৌরকর্ম করে।

'কোরা' সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাতক জন্মের পাঁচ-ছ'দিনের মাথায় নাভিপতনের পর 'ছাট্টি' বা 'কামান' অনুষ্ঠিত হয়। এই ক'দিন মা ও শিশুকে 'ধাইমা' ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করবে না। ধাইমা মা ও সন্তানকে নদী বা পুকুরে স্নান করিয়ে পুরানো পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যক্ত করায়। এরপর নাপিত প্রথমে মা ও শিশুর, পরে পরিবারের, সবশেষে সংশ্লিষ্ট গ্রামের 'মোড়ল' বা 'মাহাত' এবং 'দশভাই' (গণ্যমান্য বক্তি) এর ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে। এদিন পরিবারের পক্ষ থেকে মোড়লদের ভোজনের স্বল্পায়োজন করা হয়। সামগ্রিকভাবে একে বলে 'নাহান্ কামান্'। এইসব অনুষ্ঠানে নানারকম ঝুমুর নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়।

মাহালিদের মধ্যেও কামানের প্রায় অনুরূপ নিয়ম অনুসৃত হয়। সন্তান জন্মের পর নবজাতকের নাড়ি ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরিবার ও গ্রাম অশুদ্ধ থাকে। এসময় শিশুকে কোনো কারণেই গৃহের বাইরে আনা নিষিদ্ধ। পাঁচ-ছয়দিন পর নাভিপতন ঘটলে নাপিত পরিবারস্থ সদস্যসহ গ্রামের সকলের ক্ষৌরকর্মের দ্বারা অশৌচ ভঙ্গ করে। এদিন গ্রামের 'দশজনা' ও 'মোড়ল'এর ভোজনের স্বল্পায়োজন করা হয়। মোড়ল সংশ্লিষ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে পূজা ও গৃহশুদ্ধি করার পর ভোজনাদি পর্ব শুরু হয়। উপস্থিত সকলকে সরষে তেল ও সিঁদুর দান করা হয়। নবজাতককেও সকলে সামর্থ্যানুযায়ী জামাকাপড় টাকাকড়ি উপহার দেয়। কামানের পূর্বে নবজাতকের মা পুকুর বা ইঁদারাতলায় যায় না, খাবার জল-উঠান-চাল-ভাতের হাঁড়ি স্পর্শ করে না। এগুলি মাহালি সমাজে প্রচলিত Taboo। নবজাতকের নামকরণ পূর্বে মাস, বার অনুসারী ছিল। বর্তমানে মা-বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখার পাশাপাশি আধুনিক জনপ্রিয় নাম রাখার প্রচলনও কোথাও কোথাও আছে।

ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে সন্তান জন্মের পর প্রথম তিন-চারদিন নবজাতক ও মা'কে

ধাইমা ঘরের মধ্যে দেখাশোনা করে। শিশুর গায়ে মাখানোর তেলে হলুদ ও একজাতীয় ফল ঘষে মেশানো হয়ে থাকে। লোহার বাটিতে ঈষদুষ্ণ করে ঐ তেল মাখিয়ে ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে শিশুকে রক্ষা করা হয়। এই কয়েকদিন শিশু স্নান করে না। স্নানের দু'য়েকদিন পরে 'ডাণ্ডাখাণ্ডা' পূজা। সাধারণত মোড়ল বা অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিরা এই পূজা করে থাকে। পূজার প্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধে। এই পূজানুষ্ঠানের পর পরিবারে তথা গোষ্ঠী মধ্যে পাকাপাকিভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নবজাতকের। সকলেই নবজাতককে বলে, আজ থেকে এটাই তোমার ঘরবাড়ি। এইসময় নাগপুরের প্রসঙ্গ ওঠানো অবশ্যই কর্তব্য। পূজান্তে নৃত্যগীতসহ ভোজানুষ্ঠান হয়, মূলত ঝুমুর নৃত্যগীত হয়ে থাকে। শিশুর নামকরণের ক্ষেত্রে ওঁরাও উপজাতি পূর্বে জন্মের 'দিন' কিম্বা 'বার'কেই বিশেষ প্রাধান্য দিত। যেমন—রবিবারের জাতকের নাম—'এতোয়া', সোমবারে জন্ম হলে 'সোম্‌রা' বা 'সুম্‌রী', মঙ্গলবারে 'মংগরা' বা 'মুংরী', বুধবারে 'বুধোয়া' বা 'বুধ্‌নী', বৃহস্পতিবারে 'বীরসা' বা 'বীরসী', শুক্রবারে 'শুক্রা' বা 'শুক্রি', শনিবারে 'সঞ্চারিয়া' বা 'সঞ্চারুয়া'। এইরকম নামকরণ রীতি নিছক যুক্তিহীন ইচ্ছানুসারী মনের খেয়ালমাত্র নয়, নিরক্ষর সরল ওঁরাও সমাজ পূর্বে জন্মবারকে স্মরণীয় রাখার প্রয়াসেই এই প্রথা মেনে চলত। বরবধুর জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ—এই অনিবার্য অত্যাবশ্যক 'Taboo' কে অভ্রান্তভাবে স্মরণে রাখতে নামকরণই ছিল তাদের মোক্ষম অস্ত্র।

দুই. বিবাহকেন্দ্রিক প্রথা ও সংস্কারসমূহ

বিবাহকে ঘিরে আদিবাসী সমাজে বহুবিচিত্র প্রথা-রীতি-সংস্কারের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। জন্ম ও মৃত্যুর মতই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনকে সচল গতি প্রদানকারী ব্যবস্থারূপে 'বিবাহে'র উদ্ভবরহস্য বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ওয়েস্টারমার্কের মতে নরনারী একত্রে পারবার গড়ে বসবাস করা থেকে কালক্রমে 'বিবাহ' প্রথার উদ্ভব হয়েছে। এর বিপরীত অর্থাৎ বিবাহ প্রথা থেকে পরিবার সৃষ্টির ধারণা সত্য নয়। অন্যদিকে মর্গ্যানের মতে আদিম মানুষেরও অন্যান্য পশুর মত অবাধ যৌনমিলন ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হতে হতে একপত্নীক 'বিবাহ' প্রথার উদ্ভব। 'বিবাহ' প্রথার উদ্ভব ইতিহাস যাই হোক না কেন, আদিবাসী সমাজে সাম্প্রতিক কালেও তা গোষ্ঠীভাবনার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় লালিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন প্রজাতির আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ বা নিজ 'ট্রাইবে'র মধ্যে বিবাহই প্রচলিত। কিন্তু সেই ট্রাইবের অন্তর্গত একাধিক গোত্রের মধ্যে বহির্বিবাহ রীতি কঠোরভাবে পালনীয়, অর্থাৎ সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সাধারণত বর কনের জন্মবারে বিবাহ হয় না। আদিবাসী সমাজে এখনো 'কন্যাপণ' প্রচলিত। কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের মধ্যে 'গোত্রমিলন' ও 'সম্‌ধিমিলন' গুরুত্বপূর্ণ রীতি। গায়ে-হলুদ, সিঁদুরদানের রেওয়াজ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। বিধবাবিবাহ এবং বিচ্ছেদ পরবর্তী বিবাহ ব্যবস্থায় কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, কোথাও কোথাও দেবরণ ও শালীবরণ প্রথাও বর্তমান। 'রাভা' সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা রয়েছে। বিবাহানুষ্ঠানে আচরিত বিবিধ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আদিবাসী জীবনধারার সামগ্রিক চিত্র, তাদের সংগ্রামপূর্ণ কর্মময় জীবন, অস্তিত্ব রক্ষার

ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের দৃঢ় যোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। উড়িষ্যার ভুইঞাদের 'ঝিকা বিবাহে' ব্যাঘ্র কর্তৃক বিবাহের কনে চুরির অভিনয় প্রথাটি তাদের একান্ত অনিশ্চিত জীবন তথা কঠোর জীবনসংগ্রামের পরিচয়বাহী। পাশাপাশি বিবাহে পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের যুক্তিপূর্ণ ও উদার জীবন দর্শনের সংকেতবাহী। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে, কিম্বা পার্বত্য ত্রিপুরায় 'চাকমা' সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও পাত্রী হরণ এমনকি পাত্র হরণ বিবাহের প্রচলিত রীতি, তাদের মধ্যে ঘরজামাই রাখার প্রথাও বর্তমান। এসমস্ত রীতিনীতি আসলে এক সুপ্রাচীন সামাজিক পরিস্থিতির পৌণপুনিক অনুশীলন, যা বর্তমানে আচরিত প্রথার মধ্য দিয়ে জীবিত হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। শ্রীহট্টের দক্ষিণে 'হালাম' উপজাতির মধ্যে আবার বরকে কনের গৃহে বিবাহের পূর্বে পাঁচ বছর জন খাটতে হয়, নতুবা মোটা অঙ্কের কন্যাপণ দিতে হবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের রীতি ও প্রথাগত বৈচিত্র্য অনন্ত। কিন্তু তারই মধ্যে রয়েছে হারানো অতীতের ভাঙাচোরা প্রতিধ্বনি, রয়েছে সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর গূঢ় তাৎপর্যবাহী জীবনদর্শন।

সাঁওতাল বিবাহ বা 'বাপ্‌লা'র ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হল সমগোত্রে বিবাহ হবে না ও বরকন্যার জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত এখানেও বিবাহে 'কন্যাপণ' প্রচলিত। বর্তমানে ষাট টাকা (৬০ টাকা) কন্যাপণ ধার্য হয়। সাঁওতাল সমাজে বিবাহোপযুক্ত পাত্রী অনুসন্ধান করে বরপক্ষ, পাত্রীপক্ষ কখনো 'বর' খোঁজে না। বাইরে বাইরে পাত্রী নির্বাচন করে ঘটক বা 'রায়বার'কে জানালে সে কন্যার পিতামাতার সম্মতি নিয়ে পাত্রপক্ষকে খবর দেয়। নির্ধারিত দিনে সূর্যোদয়ের পূর্বে কন্যা দর্শনে যাবার সময় পথমধ্যে পণ্যদ্রব্যপূর্ণ গরুরগাড়ী কিম্বা জলপূর্ণ কলসীর সাক্ষাৎ লাভকে শুভ লক্ষণরূপে বিবেচনা করে। কন্যাপক্ষও অনুরূপভাবে পাত্র গৃহে যাত্রাপথে শুভলক্ষণ দেখে 'সগুণ পাঁজা' নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে জ্ঞান করে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কন্যাপণের দিন স্থির করে। নির্দিষ্ট দিনে 'গণংটাকা' বা কন্যাপণের টাকা (৬০ টাকা) রায়বারের মাধ্যমে প্রেরিত হয় কন্যাগৃহে। উভয়গৃহেই মানঝিহারামের নির্দেশে গ্রামবাসীকে আহ্বান করে হাঁড়িয়া দ্বারা আপ্যায়ণ চলে। প্রথমে পাত্র-গৃহে মান্‌ঝিহারাম, জগমাঝির স্ত্রী ও পারানিকের স্ত্রী মিলিতভাবে পাত্রকে তৈলমর্দন করে। অবশিষ্ট তেল 'ডিব্বা'য় ভরে রূপার 'কাঁচিটাকা' মুখবন্ধরূপে ঢেকে শালপত্রে আবৃত করে রায়বারের মাধ্যমে কন্যাগৃহে পাঠানো হয়। কন্যাগৃহেও মানঝিহারামের নির্দেশে গ্রামবাসীরা হাঁড়িয়া ভোজনের পর মানঝির কাছে জানতে চায় ভোজের কারণ, সেই সঙ্গে প্রশ্ন করে 'এই যে একজন ঘটক অমুক জায়গা থেকে (ঘটকের বাসভূমি নয়, 'পাত্র'এর বাসভূমির নাম বলবে) এসেছে, সে কী উদ্দেশে এসেছে।' জগমাঝি এর উত্তরের জন্য প্রশ্নটি পুনরায় ঘটকের কাছেই উত্থাপন করে। তখন ঘটক বা রায়বার বলে, 'আমি অমুক জায়গা থেকে অমুক ছেলের সাথে এই গৃহের কন্যার বিবাহের জন্য পণটাকা বা 'গণংটাকা' এনেছি।' এইভাবে প্রশ্নোত্তর উত্থাপন করাটা অত্যাবশ্যকীয় 'প্রথা'। কন্যাপণের টাকা সবাই মিলে গণনার পর তিন মোড়লের স্ত্রী (জগমাঝি-মান্‌ঝিহারাম-পারাণিক) একত্রে কন্যাকে পাত্রপক্ষ প্রেরিত ডিব্বার তৈলমর্দন করে রূপার টাকাটি যাকে বলে 'হাঁসজাঙ্গা' বা 'হাঁসটাকা', সেটি কন্যাকে দেয়। ওর সঙ্গে রাখা

বেশ কিছু টাকা মোড়লদের স্ত্রী নিজেদের প্রাপ্যরূপে ভাগ করে দেয়। তারপর শুরু হয় নাচ-গান। এরপর জম্‌ঞ্ও, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে কন্যাপক্ষের লোকজন পাত্রগৃহে যায়, সেখানে বিবাহের দিনক্ষণ স্থির করার পর ভোজন পর্ব শুরু হয়। এদিন মেয়ের গ্রামের মোড়লের অনুমতিক্রমে কন্যাপক্ষকে গান করতে হয় বিধি অনুযায়ী। এরপর নির্ধারিত দিনে 'গিরা বাঁধা' (সুতায় তেলহলুদ মাখিয়ে গিট বাঁধা হয়) অনুষ্ঠান চলে পাত্রগৃহে। এই 'গিরা বাঁধা' সুতা দিয়েই আত্মীয়-কুটুম্ব-গ্রামবাসীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। যতগুলি গিট, ততদিন পরে বিবাহ (লগ্নবাঁধার মত)। পাত্রগৃহে অনুষ্ঠান শেষে গিরা বাঁধা সুতা, ডিব্বা তেল ও হলুদ নিয়ে কন্যাগৃহে ঐদিনই পৌঁছে দেবার দায়িত্ব রায়বারের। সুতা দেখেই কন্যাপক্ষ বিবাহের স্থির দিনক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পাঠানো তৈলহলুদে স্বগৃহে 'গিরা বাঁধা' অনুষ্ঠান করে সবাইকে নিমন্ত্রণ জানায়। সাধারণত এই অনুষ্ঠানের ১৫-২০ দিন পরে বিবাহ হয়। তার আগে অবশ্য 'জলবিয়ের' অনুষ্ঠান হয়, মান্‌ঝিবুড়ির দায়িত্বে 'তেতরে কুরি', জগমান্‌ঝিসহ গ্রামের কিছু লোকজন জমিতে বা মাঠে গিয়ে খুঁটি পুঁতে সুতার পাক দিয়ে পূজা করে, শেষে দুজন কুমারী কন্যা বা 'তেতরে কুড়ি'কে দিয়ে দুই কলসী জল তুলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই জলই বিবাহে ব্যবহৃত হয়।

বিয়ের আগের দিন ছেলের বাড়িতে ও বিয়ের দিন মেয়ের বাড়িতে মাণ্ডোয়া নির্মাণ করা হয়। চারপাশে বাঁশের খুঁটি স্থাপন করে ওপরে নিম-শাল-পাকুর প্রভৃতি গাছের ডালপাতা দিয়ে মাণ্ডোয়ার ছাদ নির্মিত হয়। মাণ্ডোয়ার মধ্যে থাকে মাটির একটি থান, মারাংবুরু ও জাহের আইয়োর নামে। থানের সামনে মহুয়া গাছের ডাল স্থাপিত হয় এবং থানের নীচে আম পাতায় বাঁধা তিনটি আতপচাল, ধান, হলুদের মাথা ও দূর্বাঘাস সুতা দিয়ে বেঁধে পুঁতে দেওয়া হয়। এই একইরকম আমপাতার পুঁটুলি ছেলে ও মেয়ের হাতে পৃথকভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। এটা দিয়েই চলে তাদের 'ভাগ্য পরীক্ষা'। বিবাহশেষে ঐ পাতা খুলে যদি আভ্যন্তরীণ দ্রব্যগুলি অবিকৃত দেখা যায় তবে বরকনের জুটি সফল বলে মানা হয়, অন্যথায় বিপদ। মাণ্ডোয়ার থানকে সাক্ষী রেখে উভয়গৃহে বর ও কন্যার 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য এই গায়ে হলুদ বা 'সুনুম সাসাং'-এ বর-কনে ছাড়াও উপস্থিত উভয় গ্রামের মানঝি-দম্পতি, পারাণিক-দম্পতি, জগমাঝি-দম্পতি, বাবা-মা ও গ্রামবাসী সবাই হলুদ মাখে।

'সুনুম সাসাং' এর পর ছেলে ও মেয়েকে স্নান করানোর বিশেষ নিয়ম আছে। গৃহের আঙ্গিনায় একটা লম্বা গর্ত খনন করে তাতে দুটো জোয়াল বিছিয়ে সেখানে বাবা হাঁসুয়া বা তরোয়াল ধরে থাকে। বাবার পিছনে ছেলে, তার পিছনে আম্রপল্লব হাতে নিয়ে মা দাঁড়ায়। গ্রামের জগমাঝি বাবার হাঁসুয়ায় প্রথমে ঢালে তেল, তারপর 'জলবিয়ে'র কলসীপূর্ণ জল। সেই তেল-জলে বাবা-ছেলে-মা প্রত্যেকেই স্নানকর্ম সমাধা করে। একইভাবে কন্যাগৃহেও স্নানপর্ব চলে। এরপর বরযাত্রী বিবাহযাত্রায় বেরোয়। কন্যার গ্রামের মুখেই ঢাকঢোলসহ গ্রামবাসী, আত্মীয়রা অপেক্ষা করে, বরকে ওখানেই তেল মাখায়, গুড় খাওয়ায় কন্যাপক্ষের জগমাঝি ও পারাণিকের স্ত্রী, গ্রামের মহিলারা। তারপর কন্যাগৃহের সম্মুখের রাস্তায় তেল মাখিয়ে বরকে পুনরায় স্নান করায় কন্যার দিদি সম্পর্কিতারা। বিয়ের 'সিঁদুর-দান' অনুষ্ঠান

পূর্বে সম্পন্ন হত মাণ্ডোয়ার ভিতর, এখন মাণ্ডোয়ার পাশে খোলা আঙ্গিনায় হয়, কৌতুহলী গ্রামবাসীদের দর্শনার্থে। পাত্রের গৃহ থেকে তৈরি করে আনা ডালিতে কন্যাকে তুলে নিয়ে আঙ্গিনায় উপস্থিত পাত্রের সম্মুখে আনে পাত্রের দাদা বা অনুরূপ সম্পর্কের ব্যক্তিরা, তারা কন্যাকে দু'তিন পাক ঘোরানোর পর 'সিঁদুর-দান' হয়। আবার কখনো বা পাত্রের ভগ্নিপতিরা মিলে পাত্রকেও ঘাড়ের ওপর বসায়, সেই অবস্থায় ডালিস্থিতা কন্যাকে সিঁদুর দান করে সে। সেদিন সারারাত নাচগান, খাওয়া-দাওয়া, দান দক্ষিণার শেষে ভোরবেলা দানের হিসাব করে মোড়ল। তারপর কন্যার শ্বশুর-গৃহে যাত্রা। সেখানে গিয়ে কন্যা প্রথমে 'বর'কে স্নান করায়, তারপর 'ভাশুরে'র পা ধুইয়ে দেয়। এরপর থেকে নববধূ আর কোনোদিন ভাসুরের সামনে বসতে এবং উন্মুক্ত কেশে সম্মুখে আসতে পারবে না, আবার ভাশুরও কোনোদিন ভাদ্রবধূকে স্পর্শ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু হলে বধু দেবরকে বিবাহ করতে পারে, অন্যদিকে স্ত্রীর মৃত্যু হলে শ্যালিকা বিবাহ করা যায়, কিন্তু ভাশুর-ভাদ্রবধূর বিবাহ নিষিদ্ধ।

সাঁওতাল সমাজে বিবাহের এই রীতিনিয়মগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি হল বিবাহের প্রকার। যেমন, 'কিরিঞ্চ বাহু বাপলা' হল পাত্র-পাত্রী অনুসন্ধান করে ঘটক মারফৎ বিবাহ। 'টুংকিদিপিল বাপলা'য় শুধু কন্যাপণ নিয়ে সামান্য অনুষ্ঠানে বিবাহ-কার্য সমাধা হয়, যাদের আর্থিক সচ্ছলতা নেই তারা এই ধরনের বিবাহ করে থাকে। 'সাঙ্গা'তে বিধবা অথবা বিবাহবিচ্ছিন্না নারীর খোঁপায় সাদাফুলে তিনবার সিঁদুর দান করে সেটি গুঁজে দেয় পাত্র। এছাড়া 'অর আদের বাপলা'য় কোনো কন্যাকে জোর করে ধরে এনে জগমাঝির সহায়তায় ও কন্যার সম্মতিতে বিবাহ হয়, কন্যার অসম্মতিতে জরিমানা দিতে হয়। ছেলে-মেয়ের প্রেমপ্রীতিতে অভিভাবকদের অসম্মতিতে জোর করে যে বিবাহ হয় তার নাম 'ইতুৎসিঁদুর বাপলা' (কন্যার সিঁথিতে সিঁদুর এমনকি ধুলো লাগিয়ে বিয়ে) এবং 'ঞিরবল বাপলা' (কন্যা ছেলের বাড়িতে জোর করে থাকে)। এছাড়া রয়েছে 'ঘর জামাই' ও 'ঘরদি জামাই' প্রথা। এতে বিয়ের পর বর ঘরজামাই হয়ে থাকে।

আদিবাসী কোরাদের মধ্যেও বিবাহের সূচনা ঘটে ঘটকের দ্বারা। ঘটকের মুখে খবর পেয়ে পাত্রের গৃহের বয়োঃজ্যেষ্ঠ যেমন পিতা, জ্যেঠা প্রমুখ কন্যাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে কিছুদিন, কন্যার গৃহ থেকেও পাত্র সম্পর্কে অনুরূপ সংবাদ নেওয়া হয়। উভয়পক্ষ সম্মতি দিলে প্রথমে ছেলেপক্ষের লোকজন দলবেঁধে কন্যাগৃহে আসে, আবার কন্যাপক্ষ যায় পাত্রের গৃহে। আশীর্বাদের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে তারা পৌঁছে যায় কন্যাগৃহে। পাত্রপক্ষের লোকজনকে সযত্নে পায়ে তেলমর্দনে ধৌত করে কন্যাগৃহের মহিলারা। জলখাবার ভোজনের পর পাত্রপক্ষের জন্য নিমের দাঁতনসহ স্নানের যোগাড় করা হয়। স্নানান্তে উভয়পক্ষের মধ্যে পণসংক্রান্ত কথাবার্তা চলে। কোরাসমাজেও অন্যান্য আদিবাসীদের অনুরূপ কন্যাপণ প্রচলিত। কলাপাতায় একটি ডালি স্থাপন করে তাতে রক্ষিত আম্রপল্লবে কাঙ্খিত বস্তুটিকে সিঁদুররেখায় অঙ্কন করে দাবী জানানো হয়, কোনোপ্রকার মৌখিক বাক্যালাপ ব্যতিরেকে। যেমন—শাড়ী, তেল, সোনার মুকুট, বিবাহের বাজনা যথা বাঁশী-ঢোলক ইত্যাদি অঙ্কনের মাধ্যমে উভয়পক্ষের আকাঙ্খা অভিব্যক্ত হয়। বর্তমানে

কোরাসমাজে নির্ধারিত কন্যাপণ পঁয়তাল্লিশ টাকা (৪৫ টাকা), এছাড়া মায়ে শাড়ি, শারা ধুতি, দুই বোতল সরষে তেল দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আশীর্বাদের দিনই 'বেহাই মিলন' বা 'সম্‌ধি মিলন'-এর রীতি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আনন্দভোজের সমাপ্তিতে হয় 'লগ্নবাঁধা'। যেহেতু লগ্ন বাঁধা হয়ে গেলে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ, তাই তৎক্ষণাৎ পাত্রপক্ষকে রওনা দিতে হয় বরের গৃহে। লগ্ন বাঁধার নিয়মটিও সামান্য নয়। প্রথমে লগ্ন বাঁধার স্থানটিকে গোবিষ্ঠালেপনে শুদ্ধ করে আলপনা সজ্জিত পিঁড়ি স্থাপিত হয়। পিঁড়ির ওপর রাখা হয় শ্বেতশুভ্র মার্কিন কাপড়। এতে প্রদীপ আরতি দ্বারা 'চুমনি'র পর উভয় পক্ষ মুখোমুখি উপবেশন করে, মধ্যিখানে পিঁড়ি। তার ওপর বাঁশপাতা অথবা আম্রপল্লব, হলুদ লিপ্ত চাল, গিট বাঁধা সুতা (পাঁচটি অথবা তার কমবেশি, আসন্ন বিবাহের দিন গণনানুযায়ী গিট বাঁধা হয়) রেখে কাঁঠালপত্রে প্রস্তুত 'কুপি' প্রজ্জ্বলন দ্বারা অগ্নি সাক্ষী রেখে লগ্ন-বাঁধা হয়। আম-বট বা কাঁঠালপত্রে বিঁড়ে বাঁধা হয়। দুটি নতুন ধুতিতে লগ্ন বাঁধা রেখে গিঁট দিয়ে একটি কন্যাগৃহে রক্ষিত হয়। অপরটি যায় বরগৃহে। কন্যার পিতা সেসময় বলেন, 'বেহাই, মেয়ে কানা-খোঁড়া কি বধির আছে জানিনা, তোমরা নিচ্ছ, পরে কিছু বলবে না। হাটে হাঁড়ি কলসী নিলে তা বাজিয়ে নিতে হয় তাতে ছিদ্র আছে কিনা।' তখন ছেলের বাবা উত্তর দেন—'এখন সকাল থেকে সব ভালোই তো দেখছি। পরে যদি ভালো না থাকে তো কী করব। ডুমুরের ফুল তো নয় যে ভেঙে দেখব পোকা আছে কি না? পরে কী হবে সে হল কপাল।' এই সংলাপই বিপরীতক্রমে উচ্চারিত হবে উভয়পক্ষে। এই সংক্ষিপ্ত বাচনিক অভিনয় নিছক অর্থহীন কথার কথা নয়, এটি 'লগ্ন বাঁধা'র আবশ্যিক শর্ত। এটি বলার পর ধুতি জোড়ার একটি কন্যাপক্ষ নেবে, অপরটি পাত্রপক্ষ নিয়ে তৎক্ষণাৎ গৃহাভিমুখে পাড়ি দেবে। সন্ধ্যায় 'গোডেত' পাড়ার মেয়েদেরকে আহ্বান জানালে সকলের সমবেত উপস্থিতিতে সেদিন লগ্ন চুমানো হবে। সবাই বাদ্যযন্ত্রসহ উপস্থিত হয়। নাচ-গান-ঝুমুর ও ভোজনের আনন্দানুষ্ঠান সূচিত হয় উভয়পক্ষেই।

প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের দিন পর্যন্ত প্রত্যহ চলত আনন্দানুষ্ঠান, বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থা ও অবসরের অভাবে একদিনই নিয়মরক্ষা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লগ্ন বাঁধা ধুতি প্রথমে ঘরে তোলা নিষিদ্ধ, সেটি সন্নিকটস্থ বড় গাছ কিম্বা গৃহের চালে ঝুলিয়ে রাখা নিয়ম। রাত্রে কন্যা অথবা বরকে তেলহলুদ মাখানোর পর লগ্ন ঘরে প্রবেশ করে।

হলুদ মাখানো চাল বা সুপারি দিয়ে বিবাহের নিমন্ত্রণ জানানো কোরাদের চিরাচরিত প্রথা। বিবাহের তিনদিন আগে থেকেই বরকনেকে সকালে ও রাতে 'হারদিতেল' মাখানো হয়। বিবাহের দিন হারদিতেল না মাখিয়েই 'বর' কিম্বা 'কন্যা'কে স্নান করানো হয়।

বরের গৃহে বিবাহপূর্ব দিনে মারোয়া নির্মাণ ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়, কন্যার গৃহে বিবাহের দিন। মারোয়া পূজাকে অনেকে 'ভূত পূজা' বলে থাকে, এটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বপুরুষ পূজা। তবে, হিন্দু ধর্মান্তরীকরণের প্রভাবে তারা এসময় হিন্দু দেবদেবীর পূজাও করে। কোরাদের মারোয়া নির্মাণের বিশেষত্বটুকু এই যে, মারোয়ার কেন্দ্রস্থলে একটি লম্বা বাঁশের তীর মাটি থেকে মারোয়া ভেদ করে উঠে যায়। ঐ তীরের ওপর মারোয়ার মাথায় খর কাঁড়ি দিয়ে একটি বাঁদর নির্মাণ করা হত পূর্বে। আম-জামের পল্লব অথবা 'কুরুজ' বা করঞ্জার ডালেও

নির্মিত হয় মারোয়ার ছাউনি। চতুষ্পার্শে কলাগাছের খুঁটি স্থাপিত হয়। মারোয়ার মধ্যে 'মাহোয়ার ঠাল' অর্থাৎ মহুয়া ডাল পুঁতে সম্মুখে দুটি ঘট স্থাপিত হয়। কাঁড়ি ও খড় দিয়ে একটি ঘট পূর্ণ করে আম্র পল্লবের ওপর ধান ও সরষের তেলপূর্ণ প্রদীপ বসানো হয়। অপর ঘটটি আপাতত শূন্য রাখা হয় বিবাহান্তে অষ্টমঙ্গলায় বোনকে আনতে যাবার সময় সেটি নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সেসময় ভাই ঐ ঘটে গুড়, মুড়ি, চিঁড়া পূর্ণ করে শ্বশুড়ালয়ে গিয়ে বোনের 'খোঁচা' বা আঁচলে দিয়ে বলে যে, তোমার জন্য 'মিষ্টি হাঁড়ি' এনেছি। এটি উভয় পরিবারেই শুভসঙ্কেত সূচিত করে। বিবাহের সময় বরকনের হাতে বাঁধা 'সিনে' (আম্রশাখায় মোড়ানো রক্তমাখা আতপচাল) বদলের পরে হয় 'সিঁদুরদান'। বলা বাহুল্য, এটি গোত্রমিলনের সঙ্কেতবাহী আচার ভিন্ন কিছু নয়।

পরদিন সকালে 'দান' বা 'দক্ষিণা সমাপ্ত হলে গ্রামের বয়োঃজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে প্রণাম জানিয়ে বরবধূর সগৃহযাত্রা। বরের গৃহে উপস্থিত বর-বধু ও দেবর পুকুরে স্নান করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় একটি চিত্তাকর্ষক খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেটি মূলত নাট্যধর্মী। এই খেলাটির মধ্য দিয়ে শিকারজীবী কোরা সমাজের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ মূর্ত হয়ে ওঠে যার নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম।

মাহালি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পাকা-কথা ও দিনস্থির হওয়ার পর বিবাহের পাঁচদিন পূর্বে বর ও কনের গায়ে হলুদ বা 'সুনুম সাসাং' অনুষ্ঠান হয়। গৃহাঙ্গনে বাবা-মা-গ্রাম্যমোড়লসহ বায়োজ্যেষ্ঠ ও আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই সেই আনন্দে সামিল হয়। মাহালিদের মধ্যেও লগ্ন বাঁধার প্রচলন আছে।

আশীর্বাদের দিনই লগ্ন বাঁধা হয়। ছেলেপক্ষের বয়োজ্যেষ্ঠরা গ্রামের মোড়লসহ কন্যার বাড়ি গিয়ে লগ্ন বেঁধে আসে। মাহালিদের মধ্যেও কন্যাপণের প্রচলন রয়েছে। কনেকে বস্ত্র ও সাজসজ্জার সরঞ্জাম দেওয়া হয়। কিন্তু কনের মাকে তিনটে 'মায়ে শাড়ি', ঠাকুরমা ও দিদাকে দুটি শাড়ি, ভাই বা দাদাকে শারাধুতি এবং কন্যাপণ পঁয়ষট্টি টাকা নগদ দেওয়া বাধ্যতামূলক। বিবাহের, পূর্বদিন কনে ও বরের মা এবং উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজন গ্রামবাসী পৃথকভাবে পার্শ্ববর্তী নদী বা পুকুরে গিয়ে মাটি ও জলকে 'নিমন্ত্রণ' করে আসে জলপূর্ণ মাটির ঘট ও পানসুপারি দি:। পরদিন অর্থাৎ বিবাহের দিন সকালে মেয়েরা 'ঝুমটা গান' ও নৃত্য সহযোগে চারপাঁচটি ঘটি জলপূর্ণ করে। তারপর পুকুরধারের মাটিকে কোদালের ফলার তিন আঘাতে (িনের বেশ-কম নয়) তুলে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই মাটির কিয়দংশ দিয়ে জলপূর্ণ ঘট স্থাপনের উদ্দেশে থান নির্মাণ করা হয়। অবশিষ্ট মাটি চতুর্দিকে মণ্ড করে মারোয়ার কলাগাছ ও বাঁশ স্থাপিত হয়। মারোয়ার আচ্ছাদন বট ও মহুয়া পল্লবে নির্মিত। এই সময় মেয়েদের ঝুমটা গান ও নাচ আসর মাতিয়ে রাখে। ঝুমটা গানগুলি চটুল, রঙ্গরসিকতায় পরিপূর্ণ। বিবাহ-যাত্রাকালে কনের গ্রামে প্রবেশ করে 'দুল্হা' 'গারাম'-দেওতার থানে বাজনাসহ 'সেবা' দিয়ে বিবাহের অধিকার অর্জন করে। দুল্হাবাড়ির হলুদ মাখানোর পরে কনেকে সিঁদুর দান করা হয়। 'সিনে'-বদল হয়। উভয়পক্ষের গ্রামবাসী-আত্মীয়স্বজন পরস্পর মিলিত হয়, তাদের মধ্যে সম্ধিমিলনের আনন্দ-অনুষ্ঠান চলে। কার্যত, সিঁদুরদানের পরেই মূল বিবাহ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। পরদিন সকালে বসে 'দান'। বরকনেকে স্নানান্তে পাশাপাশি

খেজুরপাতার চাটাইতে বসিয়ে উপহার সামগ্রী দেওয়ার প্রথা রয়েছে মাহালিদের মধ্যে। শেষে গ্রামের মোড়ল সে সমস্ত সামগ্রীর হিসাব করে উভয় পক্ষের অভিভাবকদ্বয়কে জানায়। 'দান' পর্বের সমাপ্তিতে কন্যার শ্বশুরগৃহ যাত্রা। সেইদিনই কন্যার গৃহের মাড়োয়া বিসর্জন দেওয়া হয় নদী বা পুকুরের জলে। স্বামীগৃহে পৌঁছানোর পরে পুনরায় বসে 'দান', পুনরায় মোড়লকৃত হিসাব। এই হিসাবের তাৎপর্য এই যে, কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে জিনিসগুলি ফেরতযোগ্য। সেদিন রাতে বরের গৃহে আত্মীয়কুটুম্ব, গ্রামবাসীর খাওয়াদাওয়া। পরদিন কলাগাছ-কলসীসহ মারোয়া বিসর্জন। বরকনের হাতের 'সিনে' বিসর্জিত হয়। এই বিসর্জন পর্বের পূর্বে বর-কনের স্নানকে কেন্দ্র করে কয়েকটি 'খেলা' হয়, সেগুলি ব্যঞ্জনাপূর্ণ রীতিপালনের অনুষ্ঠান। গৃহাঙ্গনে নির্মিত নকল পুস্করিনীতে স্থাপিত জোয়ালে উপবেশন করে বর, সম্মুখে থাকে নববধূ। সেসময় ভাশুর বিশেষ ভঙ্গিতে জলপূর্ণ ঘটের জল সিঞ্চন করে ভাই এবং ভাদ্রবধূর ওপর। পিছনদিকে ঘুরে ঘট ওপরে তুলে নবদম্পতির দিকে না দেখে জলসিঞ্চন করাই রীতি বা নিয়ম। জোয়ালের ব্যবহার, ভাশুরের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আসলে ঐতিহ্যপূর্ণ জীবিকা বা প্রাচীন বৃত্তির স্মরণের পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ তথা পূর্বপুরুষের অনুগ্রহ-আশীর্বাদ লাভের সংকেতবাহী। অন্যদিকে জলপূর্ণ পুষ্করিণী, ঘট এগুলি জীবনে পূর্ণসমৃদ্ধি তথা 'Fertility' বা উর্বরতার দ্যোতক। আসলে আদিবাসী সমাজে 'বিবাহে'র ব্যঞ্জনা ও ব্যপ্তি কত সুদূরপ্রসারী, ব্যক্তিকে অতিক্রম করে তা যে সমগ্র গোষ্ঠীসমাজের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে কী পরিমাণে সম্পৃক্ত তার কল্পনা বা ধারণা করা দুরূহ হত যদি না এই সমস্ত প্রথা আজও বেঁচে থাকত। এই খেলাটি ছাড়াও এই নবনির্মিত পুষ্করিণীতে আংটি ফেলে বা হাতের 'সিনে' ফেলে সন্ধান পাওয়ার খেলাও চলে বরবধুর মধ্যে। জলপূর্ণ পুকুর গর্ভবতী নারীর প্রতীক। সুতরাং এ সমস্ত খেলার মধ্য দিয়ে নবদম্পতির যৌনজীবনের সূচনাও নির্দেশিত হয়। এইভাবে আনন্দ, হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে নবরূপে ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করে থাকে আদিবাসী নরনারী।

ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহে পাত্রী নির্বাচনে ঘটক বা 'আগুয়া'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আগুয়া কর্তৃক কন্যার সন্ধানপ্রাপ্ত পাত্রপক্ষ বাইরে থেকে কন্যাদর্শনে পছন্দ করলে বিবাহের কথাবার্তা শুরু হয়। সাধারণত পৌষমাসে খামারিপূজার পর বিবাহের কথাবার্তা ও অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়। গ্রামের 'দশজনা' বা গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে পাত্র-পাত্রীর পিতা বা অভিভাবকেরা নিজেদের সুবিধানুযায়ী আশীর্বাদের দিন ধার্য করেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ বা 'নেওতা' দেবার প্রথাটি অভিনব। কলাপাতার ওপর পচানিপূর্ণ হাঁড়ি রেখে তাতে একটি করে আম্রপল্লব সিক্ত করে গ্রামের প্রতি গৃহস্থকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়, গৃহস্থ অনুপস্থিত থাকলে গৃহদুয়ারের ওপর গুঁজে রাখা হয়, যাতে ফিরে এসে গৃহস্থ সেটা দেখে প্রকৃত ঘটনা অনুমান করতে পারেন। একে বলে 'লোটাকির্দানা'। আর্শীবাদের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পাত্রপক্ষ কন্যাগৃহে পৌঁছালে প্রত্যেককে সরষে তেল লেপন করে পা ধুইয়ে দেয় কন্যাপক্ষের মেয়েরা, বিনিময়ে তাদেরকে টাকাপয়সা দেয় নতুন কুটুম্বরা। এই প্রথাকে 'হেড্ডেআম্মি' বলা হয়। ওরাওঁ বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ হল 'নাগপুরযাত্রা' এবং 'সম্‌ধিমিলন'। নাগপুর তাদের আদি বাসস্থান কিন্তু পূর্বের মত সশরীরে

সেখানে উপস্থিত না হয়ে গৃহের দক্ষিণদিকে কোনো ফাঁকা জমিতে নাগপুর যাত্রার অভিনয় করে পচানিপূর্ণ হাঁড়ি ও আম্রপল্লব দিয়ে উভয়পক্ষের অভিভাবকগণ গৃহদেবতাদের নামোচ্চারণে গোত্রমিলন সম্পন্ন করেন। এছাড়াও উভয়পক্ষ সিঁদুর ফোঁটা এঁকে পচানির রসে মিলিয়ে দিয়েও গোত্রমিলন ঘটায়, পারস্পরিক তেলমর্দন ও কোলাকুলিতে ঘটে সম্‌ধিমিলন। আশীর্বাদের সময় চৌদ্দ টাকা পঁচিশ পয়সা অর্থাৎ সোয়া চোদ্দ টাকা কন্যাপণ দেওয়া হয়। পূর্বে অবশ্য একটি বস্ত্রখণ্ডকে টুকরো টুকরো করে কন্যাপক্ষ পণের শাড়ি বা বস্ত্র দাবী করত যাকে বলে 'কয়খাণ্ডাকিচ্‌রি'। ওরাওঁদের মধ্যেও মাকে 'মায়ে শাড়ি' ও ভাইকে 'শারাধুতি' দেবার প্রচলন রয়েছে। বিবাহপূর্ব দিনে পাত্রের গৃহাঙ্গনে ও বিবাহের দিন কন্যার গৃহাঙ্গনে মারোয়া নির্মাণ ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মারোয়ার খুঁটিরূপে থাকে কলাগাছ, বাঁশ ও চিরচিট্টি লতা; ছাউনি হিসাবে ধানের কাঁড়ি বা খড়ের ওপর শুকনো লঙ্কা। অপদেবতার কুপ্রভাব থেকে তা মাঙ্গলিক বিবাহানুষ্ঠানকে রক্ষা করবে বলে বিশ্বাস। মারোয়ার মধ্যে দুটি মৃন্ময় কলসী আতপচাল, ত্রিমুখী বা পঞ্চমুখী হলুদে পূর্ণ করে ওপরে ধান বিছিয়ে, তার ওপরে কলাই-লবণ-সরষেতেল পূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করা হয়। কোনো কোনো গোত্রে নিয়মানুযায়ী লাল মুরগা বা পাঁঠাবলি দিয়ে পূজা হয়। বিবাহপূর্ব দিনে পাত্রগৃহে মারোয়া-পূজার পর গারাম থানে পূজা দেওয়ার নিয়ম। পরদিন কন্যার গৃহে বরপক্ষ পৌঁছানোর পর সেখানে শুরু হয় মারোয়া পূজা, গারাম পূজা। এরপর 'কানিয়া' ও 'দুল্‌হা'কে তিনবার বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হলুদবাটা মাখানো হয়, তারপর সিঁদুরদান। বিবাহের নিয়ম পালনে কোনোপ্রকার ত্রুটি হলে বংশের কোনো ব্যক্তির ওপর 'নামান' হয় অর্থাৎ ভর নামে, ঐ ব্যক্তি তখন ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ নির্দেশ করে। এরপর সারারাত ধরে আনন্দভোজন, নৃত্যগীত চলতে থাকে। পরদিন সকালে বসে 'দান'। সকলে নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কন্যাকে নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী দান করে, মোড়ল সেসমস্ত হিসাব করে জানায় উভয়পক্ষের আভিভাবককে। কোনো কারণে বিবাহবিচ্ছেদ হলে এই দ্রব্যসামগ্রী ফেরত দেওয়াই নিয়ম। এছাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-কুটুম্ব কী দিল তারও লিখিত হিসাব থাকে, তাদের অনুষ্ঠানেও অনুরূপ দান দেওয়া কর্তব্য রূপে বিবেচিত। 'দানে'র পর স্বামীগৃহে যাত্রা। কোনো কোনো গোত্রে বরবধূ বরণের পূর্বে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, কোথাও আবার বরের বিবাহযাত্রার সময় বলি দেবার নিয়ম প্রচলিত। বলির মাংস বরবধূ প্রত্যাবর্তনের দিন রন্ধন করে সকলে মিলে খায়। বলির রক্ত বিবাহোত্তর যৌন সম্পর্ককে দ্যোতিত করে। সেদিন রাতে ভোজনপর্ব সমাধা হলে কন্যাপক্ষের আত্মীয়কুটুম্বসহ পরদিন সকালে নববধূকে নিয়ে তার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কিছুকাল সেখানে কাটিয়ে বিশেষ কোনো পরবের সময় ('খামারিপূজা' কিম্বা 'গোহালীপূজা') নববধূকে স্বামীগৃহে স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনা হয়। বিবাহানুষ্ঠান সমাপ্ত হলে আত্মীয় কুটুম নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর বর এবং কনে উভয় গৃহেই চলে ডাণ্ডাপূজা। বিবাহের বিভিন্ন পর্ব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন নৃত্য-গীতে আনন্দে মেতে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচঞ্চল ওরাওঁ উপজাতি। আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যাড়ম্বরের যুগে সমগ্র গোষ্ঠীসমাজ তথা স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার সম্পদকেই প্রাধান্য দিয়ে এই যে আনন্দানুষ্ঠান, এর মানবিক মূল্য অপরিসীম।

তিন. মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রথা ও সংস্কারসমূহ

মৃত্যুর মহাজাগতিক রহস্য প্রাচীনকাল থেকেই সচেতন মানবমনে অফুরন্ত কৌতুহল ও কল্পনার জন্ম দিয়েছে। 'কঠোপনিষদ'এ যম ও নচিকেতা সংবাদে যমরাজের কাছে নচিকেতা জানতে চেয়েছিল পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব সম্পর্কে—'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে। এতাদ্বিদ্যা মনুশিষ্টস্ত্বয়াহং/বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।। (২০।। কঠঃ)। উপনিষদে জীবাত্মাকে অজর, অমর, অমৃত ও ধ্রুব বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের স্রষ্টা বুদ্ধদেব মৃত্যুকে জয় করে জন্মান্তর রহিত অর্থাৎ নির্বাণ বা অমৃতলাভের উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতের বনপর্বে সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানে রয়েছে মৃত্যুজয়ী তপস্যার চিত্র। পুনর্জন্মরহিত হওয়ার উপায় মহাভারতে নির্দেশিত হয়েছে—'যদা স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশম্ অনুপশ্যাতি। তদা ম সর্ব্বাবিদ্ বিদ্বান না পুনর্জন্মবিন্দতি।' অর্থাৎ সেই (জীব) যখন ষড়বিংশকে দর্শন করে কেবলীভূত হন, তখন সেই সর্ববিদবিদ্বান জীব আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। এসব কথা বলার তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুকে ঘিরে যে প্রশ্নগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক আবর্তিত হয়েছে সেগুলি মূলত 'আত্মা' ও 'পুনর্জন্ম' কেন্দ্রিক, এবং তদপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এসমস্ত গূঢ় দার্শনিক প্রশ্ন উচ্চমার্গীয় ধর্মীয় মতবাদের বহুপূর্বে অনার্য আদিম সমাজেই উদ্ভূত হয়েছিল। আদিম মানুষ 'দ্বৈত আত্মা'র (Dual Soul) ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ E. B. Tylor-এর মতে, আদিম মানুষের ধারণা ছিল যে মুক্ত আত্মা সাময়িকভাবে দেহের বাইরে যায় এবং দেহগত আত্মা দেহের বাইরে চলে যাওয়ার অর্থ মৃত্যু। তারা মৃত্যু ও ঘুমের মধ্যে যথার্থ প্রভেদ নির্ণয় করতে না পেরে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সবুজ অন্ত্যেষ্টি (Green Funeral) ও কিছুকাল পরে শুষ্ক অন্ত্যেষ্টি (Dry Funeral) ক্রিয়া পালন করত। এই Animism এর ধারণার সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল জন্মান্তরবাদ ও পরলোকের ধারণাও। সেই ধারণাই কালে কালান্তরে কেমন পল্লবিত রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সামান্য সংকেত পূর্বেই নির্দেশিত হয়েছে। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রতিককালেও সেই রীতি ও সংস্কারের ধারা সজীব ও সুস্পষ্ট। অসমের 'খাসিয়া' উপজাতির মানুষ মৃতদেহকে দু'তিন সপ্তাহ তার ঘরে সযত্নে রক্ষার পরে কবর দেয় বা দাহ করে। 'কুকি' সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃতদেহকে ঘরে মাচার ওপর রেখে প্রত্যহ মদ্য-মাংস আহার দেওয়ার রীতি আছে। পাঁচ থেকে নব্বই দিন পর্যন্ত এই নিয়ম রক্ষার পরে মৃতব্যক্তির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ কবর দেওয়া হয়। এসমস্ত অনুষ্ঠানে আদিম আত্মা সম্পর্কিত ধারণা, 'ঘুম' এবং 'মৃত্যু'র প্রভেদ সম্পর্কে অনিশ্চিত ধারণার লক্ষণ প্রকটিত। 'রাভা' সমাজে আবার শিশুর মৃত্যু হলে তার হাত বা পায়ের আঙুল সামান্য কেটে কবর দেওয়া হয় যাতে পরিবারে তার পুনর্জন্মকে চিহ্নিত করা যায় সহজে। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে ধনী পরিবারে পরজন্ম লাভের প্রার্থনা এবং বৃক্ষ-পশুপাখী বা গরুরূপে জন্ম না নেবার প্রার্থনা করা হয়। এসবই পরজন্ম বা পুনর্জন্মে বিশ্বাসের আদিম ধারণা ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহ 'দাহ' এবং 'কবর' দুটিই প্রথাসিদ্ধ। কবর দেবার

সময় মৃতের পোষাক, থালাবাসন প্রভৃতি ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মৃত ব্যক্তির সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়। দ্রব্যাদির সংখ্যা প্রচুর এবং মূল্যবান হলে ঘাটস্নানের সময় সামান্য দরে নিলাম করে দেওয়া হয়। মৃতের ব্যবহৃত কোনো দ্রব্যাদি পুনরায় ঘরে ফিরবে না, মৃতের সাথে সেগুলিও বিদায় নেবে চিরতরে, এমনটাই নিয়ম। কবর দেবার পর স্নান করতে যাবার সময় 'ঘাট' কিনতে হয়। মুর্মু বা পণ্ডিত পুকুরপারে একটি স্থান পরিষ্কার করে পূজার উপযুক্ত করে। সেখানে জল ও মাটির নামে গ্রামের সবাই সাধ্যমত টাকা পয়সা দেয়। এই ক্রিয়াকে বলে 'ঘাটকেনা'। পুরুষ এবং মহিলারা স্বতন্ত্র পুকুরে পৃথকভাবে ঘাট কেনে। তারপর স্নানান্তে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে খাবার এবং পচানির ব্যবস্থা করা হয় সবার জন্য।

মৃতদেহকে শেষবার গৃহ থেকে বার করবার সময় মৃতের 'চুল' ও 'নখ' মাটির সাথে মিশ্রিত করে বেঁধে গোয়ালঘরের মাচায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। মৃতের শরীরের এই সংরক্ষিত অংশকে 'জাং-বাহা' বলা হয়। গ্রামবাসীরা কবর দিয়ে স্নানান্তে মৃতের গৃহে ফিরে অগ্নি স্পর্শ করে এবং সকলের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় পরবর্তী ক্রিয়ার দিনক্ষণ সম্পর্কে। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা সময়পর্ব নির্দিষ্ট নেই, সাধারণত কোনো ফসল উঠলে বা আর্থিক মন্দা কাটলেই ক্রিয়ার দিন ধার্য করা হয়। কেউ চাইলে আবার কয়েকবছর পরেও ক্রিয়ানুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু ঐ পরিবারের বিবাহানুষ্ঠানের পূর্বে শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম অবশ্যই মেটাতে হবে। এই পরবর্তী বা মূল শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় মহুয়া গাছের ডাল স্থাপনপূর্বক থান নির্মাণ করে সম্মুখে ফলমূল, পচানি ও পাঁঠির মাংস বলি হয়। মারাংবুরুর উদ্দেশে বলির রক্ত নিবেদন করে মৃতের পারলৌকিক সুখশান্তি কামনা করা হয়। পূর্বরক্ষিত 'জাংবাহা'কে মূল ক্রিয়াকর্মের সমাপ্তিতে পুকুর বা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে দাহ করলে অবশিষ্ট অস্থি বা জাংবাহাকেও ভাসানোর রীতি প্রচলিত। সেসময় পুনরায় 'ঘাট' কিনতে হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তি-মা-বাবা-পিতামহ-পিতামহী পাঁচ জনের নামে পূজা হয়। এঁদের উদ্দেশে হলুদ (সাসাং) সরষের তেল (সুনুম), সরষে গুঁড়ো, দাঁতন, কালোমাটি মিশিয়ে নিবেদন করা হয়। মৃতের পুত্র বা পরিবারস্থ অন্য কোনো ব্যক্তি এরপর মৃতব্যক্তিকে তার পূর্বপুরুষের হাতে উৎসর্গ করে, ফিরে না আসার অনুরোধ জানায়। এরপর সকলে মিলে গৃহে ফিরে বলির মাংসে প্রস্তুত খিচুড়ি ভোজন করে। এপ্রসঙ্গে বলা ভাল যে শ্রাদ্ধক্রিয়ার প্রায় সমস্ত আয়োজন গ্রামবাসী তথা আত্মীয়স্বজন করে থাকে, মৃতের পরিবারকে কোনোরকম খরচ করতে হয় না। গোষ্ঠীচেতনা তথা সংঘবদ্ধতার এও প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'কোরা' সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণত তেরো দিনে এবং শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যুতে পাঁচ-সাত বা এগারো দিনেও শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মোড়লের অনুমতিক্রমে দিন ধার্য হয়। গ্রামের পরিস্থিতি, আসন্ন অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করে ক্ষেত্র বিশেষে নির্ধারিত দিনের পূর্বেই শ্রাদ্ধক্রিয়া করে গ্রাম শোধন করবার রেওয়াজ আছে। কারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে শুধু সংশ্লিষ্ট পরিবার নয়, সম্পূর্ণ গ্রাম অশুচি হয়ে পড়ে। শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায় না। শ্রাদ্ধের দিন পুকুরে গিয়ে মাটির ঢিবির মত বেদী নির্মাণ করে তাতে পূজা দেয় গ্রামের গণ্যমান্য 'দশভাই', তারপর খড় দিয়ে

পুকুরপারেই কৃত্রিম ঘরবাড়ি নির্মাণ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙে দেওয়া হয়, যাতে মৃতের আত্মা ইহলোকে পুনরায় ফিরে না আসে। তাকে বারবার ইহলোক ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয় কৃত্রিম গৃহ দাহ করে। যেন খানিকটা জবরদস্তি বাধা দিয়েই বলা হয়—'তোমার ঘর পুড়িয়ে দিলাম, আসবে এবার কোথা থেকে?' বাইরের কাজ সম্পূর্ণ হলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় মৃতের উদ্দেশে ফলমূল, খাদ্য নিবেদন করে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মোড়ল, দশভাই প্রভৃতি গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের ভোজনের আয়োজন করা হয়।

দরিদ্র 'মাহালি' সম্প্রদায় মৃত্যুর পরে সাধারণত কবর দেয়। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে দাহ করে। কবর দেবার বিশেষত্ব হল—মাটি খনন করে তাতে মৃতদেহকে তার জীবৎকালের পরিধেয় বস্ত্রসহ শায়িত করা হয়। মৃতদেহের ওপর বাঁশের মাচা বা ছাউনি টাঙিয়ে গ্রামবাসী মাহালিরা সকলে মিলে মাটি দেয়। ছোট শিশু মারা গেলে পাঁচ বা সাতদিনে কাজ করা হয়। পুকুর ধারে খড়ের কৃত্রিম ঘরবাড়ি নির্মাণ করে জ্বালিয়ে দেবার রীতি মাহালিদের মধ্যেও রয়েছে। কোরাদের মতই গৃহে ফিরে মৃত আত্মার উদ্দেশে শেষবারের মত ভাত-তরকারি নিবেদন করে পুকুরে ভাসানো হয়। সবশেষে চলে ভোজনপর্ব।

অন্যান্য আদিবাসীদের মত 'ওরাওঁ' সম্প্রদায়ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হলে তেরো দিনে এবং শিশুর ক্ষেত্রে পাঁচ বা সাত দিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তির মৃতদেহ খড় দিয়ে 'দাহ' এবং শিশুকে কবর দেওয়া নিয়ম। অশৌচের দিনগুলিতে পরিবার ও সমগোত্রীয় নরনারী মাছ-মাংস ও আমিষাহার করে না, তেলসাবান ব্যবহার এবং চুল আঁচরানো নিষিদ্ধ। তেরোতম দিনে গৃহের বাইরে নাপিতের সাহায্যে ক্ষৌরকর্ম ও মস্তকমুণ্ডন করা হয়, পরিবার ও গ্রামবাসী এদিন শুদ্ধ হয়। এদিন গৃহের বাইরে মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয় পরিবার ও গ্রামবাসী (সমসম্প্রদায়ভুক্ত) দ্বারা। পুকুরধারে একটি গহ্বর খনন করে তার সম্মুখে মৃন্ময় পাত্রে ভেজে রাখা কলাই-ধান-সরষে একত্রে কলাপাতা বা শালপাতার বিঁড়েতে রাখা হয়। অপরাপর বিঁড়ের একটিতে রাখা হয় বলিপ্রদত্ত পাঁঠির হাড় বা অস্থি এবং নাড়িভূঁড়ি, অপরটিতে 'লৌহচূর্ণ' অর্থাৎ লোহা পোড়ানোর পর পরিত্যক্ত অংশ, আরেকটিতে রাখা হয় পচানি। এবার উপস্থিত পরিবারস্থ, গোত্রস্থ আত্মীয় ও গ্রামীণ স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক বিঁড়েতে রাখা উপকরণগুলি সামান্য পরিমাণে নিয়ে গহ্বরে নিক্ষেপ করে মৃতব্যক্তিকে স্মরণ করে। সকলের দ্বারা ক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার পর মাটি ভরে গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বস্তুগুলি নিবেদনের সময় মৃতের উদ্দেশে তারা ইহলোক ত্যাগের কথা বারবার উচ্চারণ করে এবং মৃতের সঙ্গে তাদের অর্থাৎ সমস্ত জীবিত পরিজনের চিরতরে ইহলৌকিক সম্পর্কছেদের কথা জানায়। এরপর সবাই বলিপ্রদত্ত পাঁঠির মাংস রেঁধে খাওয়ার পর গৃহে ফিরে পচানি গ্রহণ করে। ঐদিনেই পুনরায় মৃতের উদ্দেশে সবাই মিলে কলাপাতায় সদ্যপ্রস্তুত ভাত, মাছ, তরকারি নিয়ে গ্রামের বাইরে খোলা মাঠে উপস্থিত হয়। তাদের বিশ্বাস, মৃতের আত্মা সেখানে আসবে শেষবারের মত। মৃতবক্তির নাম সম্বোধন করে আহ্বান জানানো হয় শেষবারের মত ইহলোকের অন্নগ্রহণের জন্য। কলাপাতায় আনা ভাত তার উদ্দেশে নিক্ষেপ করে গ্রামবাসী

আত্মীয়-পরিবার-গোষ্ঠীর লোকজন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, আর কোনোদিন এ সমাজে তার খাবার জুটবে না, এই সমাজ থেকে তাকে এবার চিরতরে বিদায়গ্রহণ করতেই হবে। শ্রাদ্ধের দু'দিন পর আত্মীয় কুটুম চলে গেলে মৃত ব্যক্তির গৃহে 'ডাণ্ডাখাণ্ডা' পূজার মাধ্যমে গৃহশুদ্ধি ঘটানো হয়।

মৃত্যুকে ঘিরে প্রথা-অনুষ্ঠান পালিত হলেও শোকোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য থাকায় এই সময় বিশেষ কোনো নৃত্যগীতের ব্যবহার লক্ষিত হয় না নির্বাচিত আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে। জন্মকেন্দ্রিক আনন্দানুষ্ঠানে বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট গীতি গাওয়া হয় না, তবে অফুরন্ত ঝুমুর গীতি এবং বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী সমাজে প্রচলিত গীতিসমূহ নৃত্যসহযোগে গীত হয়। আদিবাসী সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে বিবাহকেন্দ্রিক গানগুলি। বিবাহের বিচিত্র রীতি-নীতিকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক আদিবাসী সমাজেই প্রচুর গীতি রয়েছে, অনেকগুলি আবার বিশেষভাবে বিবাহানুষ্ঠানেই গাওয়া হয়। যেমন—সাঁওতাল সমাজে 'দং', মাহালি সমাজে 'ঝুম্‌টা' মূলত বিবাহের সময়েই গীত হয়। এসমস্ত গানের মধ্যে বিবাহকেন্দ্রিক বিচিত্র সংস্কার প্রথার পাশাপাশি মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বহুবর্ণে ধরা দিয়েছে যার সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক মূল্য তুলনারহিত।

৩।

আদিবাসী পূজাপার্বণ ও সঙ্গীত

আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষিত নাগরিক সমাজ যখন সভ্যতার এক ছত্রতলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সমীকরণের পথে অগ্রসরমান, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অপরবিশ্বের অধিবাসী আদিবাসী মানুষগুলি তাদের সমাজ-সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য, জাতিসত্তাগত বিশেষ বিন্যাস বৈচিত্র্য, গোষ্ঠীগত আন্তঃসাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও ক্রমবিবর্তিত গতিময়তা নিয়ে ধ্রুবতারার মত চির উদ্‌ভাসিত। চূড়ান্ত দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও শোষণের প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস-সংস্কার, দীর্ঘ পালিত ধর্মাচরণ। বিশেষত তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি, পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানের অনন্যতা যা যুগে যুগে বহিরাগত শক্তির আগ্রাসনের লোলুপতায় বিনষ্ট না হয়ে বলিষ্ঠ প্রতিরোধে অপরপক্ষকে বশীভূত করেছে, তা নিশ্চয় অবহেলার যোগ্য নয়। আর্যপূর্ব যুগে তো বটেই, আমরা দেখেছি অনার্য উপজাতিক আচার-অনুষ্ঠান উত্তর-বৈদিক ধর্মীয় বাতাবরণকেও করেছে প্রভাবিত। বস্তুত প্রাগার্য ও আর্য ধর্মের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল হিন্দুধর্ম। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ড. অতুল সুর 'প্রাচীন বাঙলার ধর্মসাধনা' প্রবন্ধের সূচনায় এ বিষয়ে সুদীর্ঘ ও মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলাদেশে আদিম অধিবাসীদের ধর্মই অনুসৃত হত। ...বস্তুত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক কিছু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান যেমন—দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার ইত্যাদি সবই আদিম অধিবাসীদের থেকে গৃহীত হয়েছিল। ...এ ছাড়া নানারূপ গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা, ধ্বজাপূজা, বৃক্ষের পূজা, যাত্রাজাতীয় পর্বাদি ... এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও আম্বুবাচী, অরন্ধন, পৌষপার্বণ, নবান্ন ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রাক-আর্য জাতিসমূহের কাছ থেকে গৃহীত।"

অনার্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই সমস্ত উৎসব-পূজাপার্বণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে উর্বরতা ও উৎপাদনশীল সংস্কৃতিতে (Fertility cult) বিশ্বাস, সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস (like produces like) ও আত্মাবস্তু লাভের (mana) প্রাচীন ধারণা। এ সমস্তই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিক গণ্ডির পরিবর্তে সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণ কামনার সূত্রে গ্রথিত। জীবন ধারণের প্রশ্নই যেখানে মুখ্য, সেখানে জীবনের প্রাথমিক চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধারণাসমূহ ধর্মীয় পূজানুষ্ঠানে যে প্রভাব ফেলবে সেটাই স্বাভাবিক। খাদ্য সংগ্রাহক মানুষ যখন খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হল তখন তারা কৃষিকার্যে সূর্যালোক ও মাটির উর্বরতা শক্তির গুরুত্ব অনুভব করেছিল। নরনারীর মিলনে সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে সূর্য ও ধরিত্রীর (মৃত্তিকা) মিলনে

শস্যোৎপাদনের গূঢ় সাদৃশ্য তারা আবিষ্কার করেছিল। সেজন্যই শুরু হল ধরণী তথা প্রকৃতির এই সৃজনীশক্তিকে মাতৃরূপে আরাধনা। উদ্ভব হল সূর্য পূজা, বৃক্ষপূজা, সর্পপূজা ইত্যাদি। কোনো কোনো পণ্ডিত-ব্যক্তি অনুমান করেন যে সৌরদেবতার পূজা উদ্ভাবক প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আগত ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean) দ্রাবিড় গোষ্ঠী দ্বারা সূচিত হয় বৃক্ষ ও সর্পপূজা। 'The Sun and the Serpent Lore' গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—"The Dravidian speaking people is supposed to have introduced the tree and the serpent worship in India; besides it adopted most of the cultural elements including the primitive sun worship introduced by the proto. Australoid people into its own culture." সূর্যপূজা-বৃক্ষপূজা-সর্পপূজার সাথে যুক্ত হয়েছে লিঙ্গপূজা, কুমারীপূজা গ্রাম-নদী-ভূমি-অরণ্যের অন্তর্নিহিত শক্তির পূজা। প্রাগার্য সম্প্রদায়ের এই বিপুল ধর্মীয় সাধনা ও উৎসব অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে সঙ্গীতের বিপুল বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার। অতীতের বিস্মৃত বিপুল অন্ধকাররাশি অতিক্রম করে উপস্থিত এই সমস্ত ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্যগীতের আনন্দধারা। সঙ্গীতগুলিতে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় জীবনধারার ভগ্নজীর্ণ চিত্র এবং সাম্প্রতিক বাস্তবের স্পর্শমুখর রূপ যুগপৎ একীকৃত। আদিবাসী সঙ্গীতের সেই অভিনবরূপের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের পূর্বে আমরা নির্বাচিত উপজাতিগুলির ধর্মীয় পূজাপার্বণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

সাঁওতাল

দাঁসাই—বর্তমানে সাঁওতাল আদিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান দাঁসাই বা দাসাই। অনুমিত হয় যে এটি মূলত উচ্চবর্ণ আর্য এবং অনার্য আদিবাসী সংঘর্ষের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যবহনকারী উৎসব। সুর-অসুর দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূত্রে বারবার উচ্চরিত। সেখানে অনার্যদেরকে 'দাসা' বা 'দাসায়ু' সম্বোধন করা হয়েছে। সম্ভবত 'দাস' বা 'দাসায়' থেকেই 'দাঁসাই' শব্দটি এসেছে। বর্তমানে সাঁওতালদের ধারণা, হিন্দু দূর্গোৎসবে অসুর-সংহারিণী-দূর্গামূর্তিটি আসলে সঙ্কেতবাহী। দূর্গা উচ্চ অভিজাত সমাজের (আর্য) নারী যিনি সমুদ্রমন্থনে গাভীরূপে দুগ্ধদান করে নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রাণরক্ষা করেন। এখানে হিন্দুপৌরাণিক কাহিনি আদিবাসী প্রাচীন ধর্মভাবনাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। যাই হোক, দূর্গারই নির্দেশে ও চক্রান্তে বিদ্রোহী আদিবাসী 'হুদুর দূর্গা' অপহৃত হয়। পৌরাণিক অসুর বা দূর্গামূর্তির অসুর প্রকৃতপক্ষে অসুররাজ 'হুদুর দূর্গা'—এমনটা অনুমান করে সাঁওতাল পুরুষেরা সেই অপহরণের প্রতিবাদে বীরবিক্রমে যুদ্ধনৃত্য সহযোগে আক্রমণ করে দূর্গামন্দির। অস্পৃশ্য অনার্য ব্রাত্য বলে তাদের সম্মুখে রুদ্ধ হয় মন্দির দুয়ার। ভরণপ্রাপ্ত পুরুষেরা লাঠির কঠিন আঘাতে বিদ্ধ করে রুদ্ধ দুয়ার। পরবর্তীকালে কামরু গুরুর নেতৃত্বে তার শিষ্যরা দাঁসাই নৃত্য ও মন্ত্রগীতি অনুশীলন করে। সাঁওতাল সৃষ্টি কাহিনিতে এই কামরু গুরুর প্রসঙ্গ রয়েছে। পিলচু হারাম ও পিলচু বুড়ির রাখালের কাজ করেছিল অভিশপ্ত কামরু (কামরূপ>কামরূ/কামরু), যিনি পূর্বে কাউরদেশে (কামরূপ) ধর্মকুমারী সতী 'চুণ্ডীগুরু'র

কাছে ওঝাগিরি ও যাদুবিদ্যা শিখেছিলেন। পরে বহু শিষ্য তৈরি করে তিনি সর্পগীত রচনা করেন যেখানে মনসাদেবীকে 'মারাংবুরুর মেয়ে', 'জলপদ্মের কন্যা' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাপের বিষাক্ত নিশ্বাসে ভস্মীভূত কামরু পুনরায় শকুনরূপে জীবন পেয়ে কাউর খামে উড়ে যায়। বর্তমানে এই কাহিনির ভাঙাচোরা ভগ্নাবশেষের সঙ্গে 'হুদুর দুর্গা'র আধাবাস্তব-আধাকাল্পনিক কাহিনীকে মিলিয়ে একটা মিশ্র গল্প চালু আছে। সাঁওতালরা বিশ্বাস করে, কামরুগুরু তার শিষ্যদের মধ্যে যোগ্যতরদের মন্ত্রপুত জল দিয়ে শকুনে পরিণত করে কামরূপে পাঠিয়ে দেয় এবং দাসাইয়ের ধর্মীয় রূপদানকারীরূপে কামরুগুরুকেই তারা স্মরণ করে। আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার সময় 'দাসাই'-এর মূল রূপটি দেখা গেলেও এর প্রকৃত সূচনা ভাদ্রমাসে। ভাদ্রমাসে বিষহরি মনসার নামে নিজ আখড়াতে গুরু তার শিষ্যদের নিয়ে 'পইসারি' পূজা দিয়ে দাসাইয়ের সূচনা করে। পূজার পর হয় নাচগান। এখানেই 'পইসারি' পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। দাসাই-এর দ্বিতীয়পর্বে মুখ্য পূজানুষ্ঠানটি আশ্বিনমাসে দুর্গাদেবী থানে ওঠার দিন শুরু হয়। সেদিনও গুরু তার শিষ্যদের নিয়ে আখড়ায় পূজা করেন। পূজান্তে শিষ্যরা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নাচগান করে, গৃহস্থের কাছে চাল-ডাল-সবজি- টাকাপয়সা দানস্বরূপ লাভ করে, পাশাপাশি গ্রামগুলির দুটি দলের মধ্যে কখনো কখনো দাসাই নৃত্য-গীতের লড়াই চলে। দশমী পর্যন্ত চলে দাসাই-এর নাচগান। শেষদিন বিভিন্ন দাসাই দল শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে নাচগান করে। আশ্বিন মাসের এই মূল দাসাই পর্বটিকে বলে 'বেল্‌বরোম্‌'। পূর্বে সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির টানেই শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে নৃত্যগীত করত, বর্তমানে শহুরে মানুষের কাছে এই নৃত্যগীতির চাহিদা ও জনপ্রিয়তার জন্য ভাড়া করে আনা হয় 'দাসাই' দল। দাসাই মূলত পুরুষদের যৌথ রণনৃত্য, পুরুষদের দ্বারা যৌথভাবে গানগুলি গীত হয়।

সহরায়—মাঘমাসে 'সহরায়' পরবের জন্য গ্রামের মোড়ল বা মান্‌ঝি দিনস্থির করে দেয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রামের যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি সকলেই অংশগ্রহণ করে। এই পরবের আরেকটি নাম হল 'বাঁধনা' পরব। পূর্বে গ্রামবাংলায় ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না। সেসময় জ্যোৎস্নালোকই ছিল নৃত্য-গীতমুখর পরবের উপযুক্ত দিন, ফলে পূর্ণিমার সময়ই অধিকাংশ পরব হত। সহরায়ের পাঁচদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিনটিতে বাড়ি-ঘর, গৃহাঙ্গন গোবর লেপনের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি নিজেদেরও দৈহিকভাবে শুদ্ধ করা হয়। একে বলে উম্ ডাব্‌র (Um Dabra)। দ্বিতীয় দিন 'দাকা' (Daka) অর্থাৎ 'ভাত'। এদিন নানাপ্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। প্রতিদিনই এসব ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে চলে নৃত্যগীতময় আনন্দানুষ্ঠান। তৃতীয়দিনের ক্রিয়ানুষ্ঠানকে সংক্ষেপে বলে খুন্টো (Khuntau)। খুন্টো হল ছোট খুঁটি যাতে গরুর গলার রশি বাঁধা থাকে। গ্রামের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তিশালী গরু বা বলদকে বাঁধা হয় খুঁটিতে, তাকে হুলুধ্বনি সহকারে কুলো বা ডালা দিয়ে বরণ করা হয়, শিঙে মাখানো হয় তেল। গরুর গলায় টাকা, তেলপোয়া ঝুলিয়ে দিয়ে নানাভাবে তাকে উত্তেজিত করা হয়। ঐ রুটি গরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার মজাদার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গরু বা বলদের প্রতিরোধকে অতিক্রম করে যে ছিনিয়ে আনতে পারবে সে পুরস্কৃত হবে। চতুর্থদিনের অনুষ্ঠান 'জালি'। যে গ্রামে পরব, সেই গ্রামেরই

ছেলে-মেয়েরা সেজেগুজে গ্রমের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহ করে মহানন্দে ভোজন করে। পঞ্চম তথা শেষদিন 'সাকরাত'। এদিন সাঁওতাল পুরুষেরা শিকারে যায়। সাক্রাতে যাবার পূর্বে গৃহাঙ্গনারা পূজা ও উলুধ্বনি দেয় যাতে কাঙ্খিত শিকার নিয়ে পুরুষরা নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়। এইভাবে পাঁচদিনের সহরায় পরব বিচিত্র ক্রিয়াকর্মে ও নৃত্যগীতানুষ্ঠানে আদিবাসী পল্লীগুলিকে আনন্দে মুখর করে তোলে।

বাহা—ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে সাধারণত এই পরবের সূচনা হয়। প্রকৃতির পূজারী আদিবাসী সাঁওতালগোষ্ঠীর 'শাল' ও 'মহুয়া' ফুলকে ঘিরে প্রকৃতিকেন্দ্রিক উৎসব 'বাহা'। 'বাহা' শব্দের অর্থ 'ফুল'। মারাং বুরু, মরৈকু-তুরৈকু ও জাহের এরার কাছে এই দুটি পুষ্প নিবেদনের পর তারা নতুন বছরের মহুয়া ফুল খায়, মাথার খোঁপায় বাঁধে শালফুল। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরবে নির্দিষ্ট দেবদেবীর উদ্দেশে প্রথম উৎপাদিত শস্য ফলমূল নিবেদন করে ব্যবহারের রীতিটি আদিবাসী সংস্কার থেকেই যে এসেছে সেটি বোঝা দুঃসাধ্য নয়। দু'দিনের 'বাহা' পরবের প্রথম দিন নায়কি ও তার স্ত্রী, সেই সঙ্গে গ্রামের নারী পুরুষেরা পুষ্করিণীর জলে (নারী ও পুরুষের পৃথক পুষ্করিণী) স্নান করে শুদ্ধ হয়। এদিন নায়কি ও তার স্ত্রী রাত্রে হবিষ্যান্ন খেয়ে পৃথক শয্যায় শয়ন করে সংযমপূর্ণ ও শুদ্ধাচারে থাকে। কারণ পরদিনে 'বাহা'র মূল পূজার দায়িত্ব তার। পরদিন স্নান করে শুদ্ধাচারে ফুল ফলের ডালা মাথায় ধারণ করে, হাতে ঝাঁটা ও খেজুর পাতার চাটাই নিয়ে নায়কির স্ত্রী, নায়কি জলের ঘটি ও ধুপসিঁদুরের ডালি সহ চলে জাহের থানে। জাহের থান সাধারণত বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে কিছুটা উঁচু জমিতে বড় বড় গাছে ঘেরা একটুকরো জঙ্গল সদৃশ শ্যামল উর্বর ভূমিতে করা হয়। পূর্ব দিন জাহের থানে তিন দেবদেবীর থানকে ঘিরে খড়ের মাচা বাঁধা হয়। সাধারণত শালগাছের নীচে মাচা বাঁধা হয়। মেয়েদের দুরুমজা নৃত্য ও গীত গ্রামের আকাশ-বাতাস ও মেঠো যাত্রাপথকে করে মুখরিত। জাহের থানটি নায়কির স্ত্রী পরিষ্কার করার পর মূল পূজারম্ভ হয়। ধুপ-দীপ-সিঁদুর-আবির-ফুল দিয়ে পূজার সাথে সাথে মাদল, টামাক ও শিঙ্গার ছন্দে ছন্দে চলে 'বাহা' গান ও নাচ। শেষে লাল মুরগী ও সাদা মোরগ বলি দিয়ে সেই মাংসের খিচুরী রেঁধে সবাই মিলে খায়। পূজান্তে নায়কির কাছে পাওয়া আশীর্বাদী শাল ফুল মেয়েরা সম্বৎসর সযত্নে রক্ষা করে।

কারাম—সাঁওতাল আদিবাসীরা অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় সাধারণত কারাম উৎসব করে। এই কারাম ব্রতে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো জাওয়া জাগানোর অনুষ্ঠান হয় না। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলে মিলে জোড়া করমের ডাল ভেঙে এনে আখড়াতে সেটি স্থাপন করে পূজা করে। করম ডালের সামনেই শোনা হয় কার্মু-ধার্মু ও কার্মী-ধার্মীর সুদীর্ঘ কাহিনি। সারারাত ধরে চলে বিশেষ অনুষ্ঠান 'কারাম সাতোর'। এতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যপূর্ণ সৃষ্টিপুরাণ কাহিনিকে 'গীত' এবং 'কথা' সহযোগে অনেকটা পাঁচালীর গানের মতো বৈচিত্র্যহীন একই সুরে, বাদ্য যন্ত্রসহ রূপদান করা হয়। প্রায় সারারাত ধরে মাদল, ধামসা, টামাক, তিরিয়ো বা বাঁশী, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চলে 'কারাম সাতোর'। পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টিতে করম ডালের ভূমিকার প্রত্যক্ষ উল্লেখ সাঁওতালদের সৃষ্টি পুরাণে

রয়েছে, সেকারণে এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে এক পবিত্র ধর্মীয় অনুষঙ্গ। করম গাছের ডালেই সৃষ্টি হয়েছিল হাঁসিল ও হাঁসলির। তার থেকে 'মানোয়া' বা মানব সৃষ্টি (পিলচু বুড়ি ও পিলচু হারাম) কীভাবে হল, কীভাবে সৃষ্টি হল 'ধরতি' বা পৃথিবী এসবেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ সাঙ্গীতিক ভাষ্য 'সাতোর'। কারাম উৎসবের আগে সাঁওতালরা ঘর-বাড়ি-গ্রামের আখড়া খুব ভালো করে গোবর লেপে পরিষ্কার করে। 'কারাম' উৎসব ঘিরে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে চলে গান নাচের প্রতিযোগিতা তবে এগুলিতে পুরুষের ভূমিকাই মুখ্য।

চড়ক—মালদহে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো ব্যাপকভাবে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাহালি, মালপাহাড়ী, কোরা ইত্যাদি আদিবাসীরাও বিভিন্ন স্থানে চড়ক পূজা করে। আবার আদিবাসী নয় এমন সম্প্রদায়ের মানুষও এতে অংশ নেয়। সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত চড়ক পূজায় সম্পূর্ণ মাস ভক্তাদের অত্যন্ত সংযম ও নিয়ম নিষ্ঠাভরে থাকতে হত। বর্তমানে মূল পূজার আগে সাতদিন বা পনেরো দিন নিয়ম মানা হয়। চড়ক পূজার সূচনা হয় 'ধুপ দেওয়া' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেদিন গ্রামের 'পাট ঠাকুর' (বেলকাঠ ও নিমকাঠ নির্মিত) মন্দির থেকে নামিয়ে পথে পথে ঘোরানো হয় এবং সেইসঙ্গে নাচ-গান প্রদর্শন করে ভক্তার দল। দলের মধ্যে একজন থাকেন মূল সন্ন্যাসী, তিনি নেতৃত্ব দেন বা পরিচালনা করেন ভক্তার দলকে। এই দিন থেকে তারা গৃহত্যাগ করে অন্যগ্রামে চলে যায়, সেখানে প্রতিদিন পাট ঠাকুর পূজা করে, ভিক্ষালব্ধ খাবার খায়, নিরামিশ ভোজন করে। স্নানের সময় সাবান-তেল মাখা নিষিদ্ধ, উপরন্তু এক বস্ত্রেই দিনযাপন করতে হয়। সংক্রান্তির আগের দিন বা মূল চড়ক পূজার আগের দিন তারা স্বগ্রামে ফিরে অন্য কারো গৃহে আশ্রয় নেয়। এই দিনটিকে বলে 'অধিবাস', এদিন শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় পূজার থানে। সন্ধ্যায় শ্মশানে গিয়ে সন্ন্যাসীরা বা ভক্তার দল পূজা করে, সেসময় কারো কারো দেহে 'ভরণ' নামে। মূল পূজার দিন সূর্যাস্তের আগে নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ ঋজু শালকাঠ স্থাপন করে পূজা করা হয় ধূপ-দীপ-সিঁদুর-ফলমূল সহযোগে। তারপর মূল সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে ভক্তার কোমরে নতুন ধুতি বেঁধে শালকাঠের ওপর ঘোরানো হয়। আদিবাসীদের মধ্যে 'বান্নাম' দিয়ে পিঠ ফুঁড়ে ঘোরার নিয়ম নেই। পূজার পরদিন ঘাটে গিয়ে নাপিত দ্বারা চুলদাঁড়ি কেটে 'কামান' করে, শেষে 'মৎস্যমুখি' করে অর্থাৎ মাছ খেয়ে সন্ন্যাসী 'ভক্তার' দল ব্রতভঙ্গ করে নিজের নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অনেক স্থানে এদিন দুপুরে যজ্ঞ ও মহামায়া পূজাও হয়। 'চড়ক' উপলক্ষে সারারাত ধরে চলে আদিবাসী মেলা। মালদহ জেলায় 'সজনা মেলা' প্রাচীনতম আদিবাসী মেলা এবং এটি চড়কপূজা উপলক্ষেই সংঘটিত হয়ে থাকে। চড়কপূজাকে কেউ কেউ সূর্যপূজা, ধর্ম দেবতার পূজা বা শিব পূজা বলে থাকেন। একথা সত্য যে শিবের মূর্তি তুলে এসময় পূজা হয়, পবিত্র 'শাল' বৃক্ষ আদিবাসীদের কাছে 'সত্য' ও 'ধর্মে'র প্রতীক, আবার শালকাঠে ভক্তাদের ঘূর্ণন সূর্যপূজার সংকেতবাহী। সাম্প্রতিককালে চড়কের এই মিশ্রিতরূপ থেকে আদিরূপটিকে শনাক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

কোরা

কারাম পূজা—এই উৎসব ভাদ্রমাসের নবমী-দশমী-একাদশী কিম্বা সংক্রান্তির দিন কোরা উপজাতি পালন করে থাকে। কুমারী ও বিবাহিতা কন্যারা এই ব্রত পালন করে তাদের ভাই বা দাদার মঙ্গলকামনায়। মূল পূজার চারদিন আগে স্নানান্তে তারা একটি নতুন ডালায় মাটি পূর্ণ করে তাতে কুর্তি কলাই ও মাসকলাই রোপন করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জল দেয়, একে বলে 'জাওয়া জাগা'। এই দিনগুলিতে তারা আমিষ খাবার খায় না, সারাদিন উপবাস করে সন্ধ্যায় রান্না করা ভাত ঠাণ্ডা করে খায়। চুল আঁচরানো নিষিদ্ধ। এই ব্রতীদেরকে বলা হয় 'পারবেতি'। পূজার দিন সন্ধ্যায় ভাইয়ের দেওয়া নতুন বস্ত্র পরিধান করে পারবেতিরা যায় 'ডায়ের পূজা'য় নৈবেদ্যর ডালা নিয়ে। ডালায় থাকে তেলপোয়া, ধানের 'পাতি', সরষে তেল, প্রদীপ ও ধুপ, কাঁঠাল পাতার বিঁড়িতে ছোলা, শশা। তার আগে করম ডাল কেটে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়। পাশে অঙ্কুরিত শস্যের দুটি থালা ছোট মাচার ওপর রাখা হয়। সেখানে গ্রামের মাহাত, করম ডাল কর্তনকারী যুবক দ্বারা 'ডায়ের পূজা' বা করম ডাল পূজার পর ভাই বোন নির্বিশেষে সকলে ভক্তি ও মনযোগ সহকারে ধানের পাতি হাতে নিয়ে শোনে 'কারাম খেসা'। তারপর মেয়েরা নৈবেদ্য নিবেদন করে, করম ডালে শশা, তেলপিঠা বাঁধে এবং বৃত্তাকারে ডালকে প্রদক্ষিণ করে গীত সহকারে। শেষে দুটি মুরগা বলি ও পচানি নিবেদন করা হয় কারামের উদ্দেশে। বলি প্রদত্ত মোরগের মাথা মোড়ল ভক্ষণ করে এবং বাকী মাংস পরদিন করম ডাল বিসর্জনান্তে খিচুরী সহযোগে সকলে ভাগ করে খাওয়া হয়। মূল পূজার দিন সারা রাত চলে ঝুমুর নৃত্য। পারবেতিরা ভাইয়ের হাতে বানানো ও ভুক্তাবশিষ্ট গুড়জল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করে। পরদিন সূর্যোদয়ের পর যথারীতি 'ডাল' পূজা করে বিসর্জন। উৎসবটি বর্তমানে বাঙালি হিন্দুর ভাইফোঁটার মত ভাইবোনের পবিত্র বন্ধন ও মঙ্গলকামনার প্রতিভূ হয়ে উঠলেও আদিতে এটি যে শস্যোৎসব ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সহরায়—মাঠ থেকে সোনালী ধান গৃহে আসার পর সাধারণত মাঘ মাসের মধ্যেই এই পরব হয়। ঘরবাড়ি, গোয়ালঘর গোবর দিয়ে লেপে শুদ্ধ করা হয় প্রথম দিন। পরের দিন গ্রামের রাখালরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহস্থের কাছ থেকে চাল, ডাল, সবজি, টাকাপয়সা সংগ্রহ করে। হাঁড়িয়াসহ সংগৃহীত দ্রব্যগুলি এবং নিজেদের উৎকৃষ্ট গরুটিকে নিয়ে তারা একটি সুনির্দিষ্ট মাঠে জমায়েত হয়। সেখানে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গোবর লেপন করে একটি ডিম স্থাপন করা হয়। এই সঙ্গে গুরুগুলিকেও ধূপ সিঁদুর দিয়ে পূজা করে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। যে গরুটি আগে এসে ঐ ডিমটি ভাঙবে তার মালিককে দণ্ডস্বরূপ পরবর্তী বছর গ্রামের লোকজনকে হাঁড়িয়া খাওয়াতে হয়। এরপর দীর্ঘসময় ধরে চলে নাচগান। একে অন্যের গৃহে সবাই ঘুরতে যায়। সেদিন হাঁড়িয়া দিয়ে চলে অতিথি আপ্যায়ন। নতুন চালের ব্যঞ্জনের আয়োজন করা হয়। শেষদিন বলিপ্রদত্ত পায়রা বা মুরগীর ছোট ছোট টুকরোতে চালের গুঁড়ো মাখিয়ে সেটি একটি কলাপাতায় মোটা রুটির মত গোলাকারে লেপন করে উনানে ঝলসানো হয়। ঐ রুটিকে কেটে কেটে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে চূড়ান্ত

অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত কোরা সম্প্রদায় কোথাও কোথাও এক দিনেই সংক্ষিপ্তরূপে পালন করে 'সহরায়' পরব। এই উৎসবটির মধ্যে অতীতদিনের সুখসাচ্ছন্দ্যময় সহজসরল আদিবাসী জীবনধারার বাস্তবচিত্র আভাসিত। তাদের সামাজিক সংঘবদ্ধতা, শ্রমক্লিষ্ট জীবনের মাঝে ক্ষণিকের অবসর বিনোদন, পারস্পরিক সৌজন্যের আদানপ্রদান, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্কের পরিচায়ক 'সহরায়' উৎসব। কৃষিজীবী আদিবাসীর পশুপ্রীতির নিদর্শন 'সহরায়', ধর্ম এখানে কর্মানুসারী।

গারাম পূজা—অগ্রহায়ণ মাসের শনিবার অথবা মঙ্গলবারে নতুন ধান উঠলে কোরা সম্প্রদায় গারাম থানে পূজা দেয়। বড় অশ্বত্থ বা বটগাছের নীচে মাটির গোলাকার ঢিপি প্রস্তুত করে দেবদেবীরূপে পূজা দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের আনীত নতুন ধানের চাল, চিনি, কলা, দুধ মিশ্রিত করে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি প্রচলিত। এই পূজা গ্রামের মোড়ল বা মাহাত দশভাইয়েরা মিলে করে। পূজার শেষে মোরগ বলি এবং পায়রার পালক রেখে পায়রা ওড়ানো হয়। বলির মাংস দিয়ে খিচুরী প্রস্তুত করে কোরা গ্রামবাসী আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে। নতুন ধানের উৎসব হলেও বাঙালী হিন্দুর 'নবান্নে'র সাথে এর প্রধান পার্থক্য হল, নবান্ন ব্যক্তিগত উৎসব—ব্যক্তির ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যদিকে গারাম পূজা কোরাদের গোষ্ঠীগত উৎসব। হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার পরিবর্তে গারাম ঠাকুর প্রস্তর খণ্ড বা মাটির থানে পূজিত হন। পূজা কোনো হিন্দু ব্রাহ্মণের পরিবর্তে গ্রামের 'মাহাত' ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা করে থাকে। 'গারাম' থানে পূজা অবশ্য বিভিন্ন পূজার প্রারম্ভেও করে থাকে 'কোরা' উপজাতি। যেমন, ভাদ্রমাসে করম ডাল পূজার পূর্বেও 'গারাম' থানে দুর্গা ও 'সাতবোনে'র পূজা দেওয়ার বিধি আছে। এছাড়া এই সময় শিবশঙ্করের নামে ডালি সাজিয়ে পূজা দেওয়া হয় থানে। কাঁচা দুধ ও দইসহ দেবতাস্নান করানো হয়। রামচন্দ্রও কোথাও কোথাও পূজিত হন। এগুলি পার্শ্ববর্তী বাঙালী তথা হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয়বাহী।

'কেরা' পূজা ও 'নামান' গান—সাধারণত ভাদ্রমাসে 'কোরা' সম্প্রদায় মনসা বা বিষহরি পূজা উপলক্ষ্যে কেরাপূজা করে থাকে। বিষহরা মনসাদেবীর নামে পূজা দিয়ে কলাগাছের সম্মুখে বিষজলের ঘটি বা মন্ত্রপড়া জলের ঘটি স্থাপন করে 'হাত চালাচালি'র দ্বারা চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট গুরু বা ওঝা গুনিনদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াই 'কেরা পূজা'। প্রথমে বিষের ঘটিতে পূর্ব নির্দিষ্ট ইচ্ছুক ব্যক্তির হাত ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বিষ তার দেহে সঞ্চারিত হওয়ার পর 'হাত' আপনা আপনি চলতে থাকে। চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট গুনিনরা তখন বিষ নামানোর মন্ত্রগীত গাইতে থাকেন। যে গুনিনের দিকে আক্রান্ত ব্যক্তির হাত যায় সে বা তার দলই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ও পুরস্কৃত হয়। আদিবাসীদের সর্প অধ্যুষিত জঙ্গলময় স্থানে জীবনযাপনের সূত্রে সর্পমন্ত্র-সঙ্গীত-ক্রীড়া ও সর্পদেবীর পূজা একটি অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণতি। কেরা পূজাই শুধু নয়, ভাদ্রমাসে মনসাপূজাকে ঘিরে চলে 'নামান' গান অর্থাৎ বিষনামানোর গান। নির্দিষ্ট রীতিতে পূজা এবং জোড়া পায়রা উড়িয়ে হাঁস বলির পরে বিভিন্ন দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করতে 'নামান' গান শুরু হয়। এছাড়া, আশ্বিন মাসের শুরু থেকে বিষ নামানোর মন্ত্র গীত হয়। একে বলে 'সাপ কাটি মন্ত্র'। গুরু অর্থাৎ গুনিনের নেতৃত্বে শিষ্যরা বিষ নামানোর মন্ত্র শিক্ষা করে। এই সমস্ত মন্ত্রগর্ভ

গানগুলিতে মনসা, শঙ্কর-মহাদেবকে বিশেষরূপে আরাধনা করা হয়। সেইসঙ্গে মানুষের দেহকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের আধাররূপে কল্পনা করে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে বিষ নামিয়ে পাতালে এবং শেষে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। দূর্গাপূজার আগে পর্যন্ত চলে 'নামান' গান।

মাহালি

গারাম পূজা—প্রকৃতি-পূজারী আদিবাসীরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকরণ সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে এক অজ্ঞেয় রহস্যময়ী শক্তির কল্পনা করে তাকে তুষ্ট রাখার নানাবিধ কৌশল ফেঁদেছে। তারা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে পূজা করেছে প্রকৃতির বিচিত্র রূপকে—নদী-ভূমি-সূর্য-চাঁদকে। এমনকি গ্রামের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মঙ্গলামঙ্গলের পশ্চাতেও সক্রিয় সেই পরম শক্তির কল্পনা করে তার 'গারাম থান' নির্মাণ করে 'গারাম দেবতা'কে পূজার্চনার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে। মাহালি উপজাতির মধ্যে সাধারণত বৈশাখ মাসের শেষ শনিবার গ্রামের সুনির্দিষ্ট বটগাছের নীচে প্রতিষ্ঠিত গারাম থানে শিলামূর্তিতে পূজিত গারাম দেবতাকে সারাদিন উপবাসী থেকে কলার ছড়া, ফলমূল, দুধ, বাতাসাভোগ ও সিঁদুর দিয়ে আরাধনার রেওয়াজ আছে। পূজা করে গ্রামের মোড়ল। গারাম ঠাকুরের পূজায় পাঁঠা, জোড়া পায়রা বলি দিলেও মুরগী বলি হয় না। গারাম পূজায় নারীদের সরাসরি পূজা দেবার অধিকার নেই। কোনো কোনো গ্রামে গারাম দেবতা রূপে মারাংবুরুও পূজিত হন। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ ও মাংসের খিচুরী ভোগরূপে গ্রহণ করে সবাই নৃত্য-গীতের মাধ্যমে উৎসব-আসর মুখরিত করে।

আষাঢ়ি পূজা—আষাঢ়ি পূজা হল মাহালিদের শস্যোৎসব। আমনধান বা 'ডাঙ্গিধান' রোপনের পূর্বে আষাঢ় মাসের যে কোনো বুধবার বা শনিবারে গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ়ি পূজা। আষাঢ় মাসের উৎসব বলে আষাঢ়ি পূজা। এই পূজা সমাপ্তির পর ধান্যচারা রোপন শুরু হয়। অর্থাৎ অধিক ফসল উৎপাদনের কামনায় এই উৎসব। এই পূজায় পায়রার বাচ্চা বলি দিয়ে সিঁদুর ধূপে গৃহের দেবদেবী আরাধনা করা হয়। মাহালিরা মনে করে, বর্ষাকালে চাষের জমিতে বিষাক্ত পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই পূজা করা আবশ্যক। তাদের বিশ্বাস, ধনসম্পদের দেবী (ধান) ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠের জিম্মায় যাচ্ছে, আবার সে ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে অগ্রহায়ণ মাসে। মাঝে এতগুলো মাস মাঠে পড়ে থাকবে দেবী, তাই এই পূজা। মাহালিরা আরেকটি কারণও এই পূজার পিছনে সক্রিয় বলে মনে করে, সেটিই মূল ও আদি কারণ বলে মনে হয়। কারণটি হল, পাশাপাশি দুই ব্যক্তির জমিতে ধানের ফলন সমান হয় না, কারো বেশি কারো কম। এর মূলে রয়েছে দেবীর অতুষ্টি ও পরিতুষ্টিজনিত অনিবার্য পরিণতি। দেবীকে তুষ্ট করে অধিক ফলনের আকাঙ্ক্ষায় এই আষাঢ়ী পূজা। সারাদিন উপবাস করে গৃহের প্রাঙ্গণে কালপঞ্চমী ও নাগপঞ্চমীর নামে পূজানিবেদিত হয় ক্ষীর, পায়েসান্ন যোগে। পায়রার বাচ্চাকে মাথায় সিঁদুর লেপে চালের দানা খাইয়ে প্রাঙ্গণেই বলি দেওয়া হয়। তারপর ভাত মাংস রেঁধে ভোজন করা হয়। এই পূজা ঘরের ধনদেবীকে মাঠে রক্ষা করবে বলে মাহালিদের বিশ্বাস। এটি গারামপূজা অথবা কারাম ব্রতের মত গ্রামীণ পরিবারগুলি সমবেতভাবে করে না, প্রতি গৃহে পৃথকভাবে পূজার

আয়োজন করা হয়। তবে আষাঢ়ি পূজা আদিম মাতৃ আরাধনা বা মাতৃরূপী ধরিত্রী পূজার আধুনিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়।

কর্মাপূজা—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতেই অনুষ্ঠিত হয় কর্মাপূজা। মাহালিদের এই জনপ্রিয় ব্রতানুষ্ঠান বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। কোরা সম্প্রদায়ের মতই মাহালিদের কর্মাপূজায় ভ্রাতার সমৃদ্ধি কামনার বহিরাঙ্গিক কাঠামোর অন্তরালে শস্যোৎসবের চরিত্রধর্ম দৃষ্ট হয়। এই আদিম গুরুত্বপূর্ণ ব্রতটি মাহালি সমাজে দ্রুত হ্রস্বায়নের কারণ প্রথমত, ক্রমান্বয়ী অর্থনৈতিক শোষণ ও দূরবস্থা এবং মাহালিদের একটি বৃহত্তর অংশের খ্রিস্টান ধর্মান্তরীকরণ। হিন্দু ধর্মান্তরিত মাহালি উপজাতি হিন্দু দেবদেবীর মান্যতা ও পূজা প্রদানের পাশাপাশি নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকেও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অনুসরণ করে চলেছে, কিন্তু খ্রিস্টানদের মধ্যে যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম পালনের রেওয়াজ, ততটা একনিষ্ঠ ভাবে নিজস্ব পূজা-পার্বণ অনুসরণ ও অনুশীলন না করবার সংযত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শুধু মাহালি নয়, প্রায় সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই মন্তব্যটি কমবেশী প্রযোজ্য। ভাদ্রমাসে কর্মা উপলক্ষে কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা ভাইয়ের বাড়ি বা পিতৃগৃহে এসে সকলে মিলে ডালিতে মাসকলাই-কুর্তিকলাই রোপন করে 'জাওয়া' জাগায়। পঞ্চম দিন বা সপ্তম দিনে মূল পূজা। প্রাঙ্গণের মাটি গোবরে লেপে কারাম ডাল রোপণ করা হয়। সামনে থাকে তেলরুটি, শশা, ফলমূলের ডালি। পাশে ছোট মাচার ওপর অঙ্কুরিত শস্যের ডালি। মাহালিদের কর্মায় একটি অভিনব সংযোজন হল ঘোড়সওয়ারী কর্মার মৃন্ময় মূর্তি, সেটিকেও কর্মাডালের পাশে মাচার ওপর রাখা হয়। প্রথমে কারাম খেসা শুনে, কারাম ডালে তেলপিঠা বেঁধে ভাইয়ের হাতে গুড়জল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ। সারারাত ডিগা মাদলের ছন্দে ছন্দে চলে ঝুমুর নৃত্যগীত। পরদিন পুনরায় কারাম ডালকে ঘিরে নাচগান করে পুস্করিনীতে সূর্যোদয়ের পর ডাল বিসর্জন। বেলায় খিচুরি ভোজনের মধ্য দিয়ে ব্রতের সমাপ্তি। কোরা উপজাতির সঙ্গে মাহালিদের আচার অনুষ্ঠানে আশ্চর্য মিল লক্ষণীয়।

জিতাষ্টমী—ভাদ্রমাসে জিতাষ্টমীর দিন জিমূতবাহনের পূজা করে মাহালিরা, সেদিন তারা বিষহরি মনসাপূজাও করে। পূর্বদিন উপবাসী থেকে স্নানের সময় ঝিঙে পাতায় জিতবাহনকে স্মরণ করে তেলহলুদসহ পুকুরপাড়ে নিম ডাল স্থাপনপূর্বক নৈবেদ্য উৎসর্গ করে থাকে ব্রতীরা। গৃহে ফিরে তিনটি ঝিঙে-পাতার থালায় ভাত-ডাল-তরকারী-কচুঘাঁটি-ঝিঙের নানাবিধ ব্যঞ্জনসহ ভোগ ভগবানকে উৎসর্গ করে গৃহের চালের উপর। এই প্রসাদ ব্রতীরা গ্রহণ করে না। পশুপাখীরাই খায়। এই নিবেদন সকালে, সূর্যাস্তের সময় ও রাতে একই পদ্ধতিতে করতে হয়। ব্রতীরা এদিন আতপ চালের নিরামিষ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। পরদিনও স্নানান্তে পূজা দিয়ে অন্ন গ্রহণ। তৃতীয় দিন স্নানান্তে 'বাসী পূজা' দিয়ে অন্ন গ্রহণ। পূর্বে এ দিন ডালা ধরে ব্রতীরা ও গ্রামের মেয়েরা নাচগান করত, বর্তমানে প্রায় হয় না বললেই চলে।

জিতাষ্টমীর দিন গৃহের বাইরে প্রাঙ্গণে মনসাপূজা করে থাকে কেউ কেউ; বিশেষত যাদের গৃহে 'মনসা' দেবীর মূর্তি পূজা হয়। সবাই এই পূজা করে না। এদিন বিভিন্ন স্থানে মনসাপূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে, মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল 'কেরাপূজা'। 'কেরাপূজা'র

পদ্ধতিটি কোরা সম্প্রদায়ের পূজার সঙ্গে হুবহু মিলযুক্ত, সেই কারণেই স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঘুর‍্যা পূজা—দুর্গা পূজার সময় নবমী তিথিতে বিশ্বকর্মার নামে এই পূজাটি করে থাকে মাহালিরা। মাহালিদের প্রধান পেশা বাঁশের কাজ। কৃষি, শিকার, পশুপালন, মাছধরা—যে জীবিকাতে যুক্ত থাকুন না কেন, বাঁশের কাজ করে না এমন মাহালি মেলা দুষ্কর। এই কাজে অত্যাবশ্যক যন্ত্র হল 'ঘুর‍্যা' ও লোহার 'কাট্‌রি'। এগুলির উদ্দেশে সেদিন পূজা দেওয়া হয়। মুরগা বলি হয়, অভাবে চালকুমড়া বলিও চলে। শেষে মাংসের খিচুরি ভোগ বাড়ি বাড়ি পাঠানো হয়।

নবান্ন—অগ্রহায়ণ মাসের যে কোনো শনি বা বুধবার, নতুন ধান ঘরে তোলার পর গ্রাম্য মোড়ল নির্দেশিত দিনে পালিত 'নবান্ন' উৎসবে নতুন চাল, গুড় ও ফল মিশ্রিত ভোগ গৃহদেবতার (অড়াঃ বোঙ্গা) উদ্দেশে নিবেদিত হয়। পূজান্তে প্রসাদ ভক্ষণের পর নতুন চালের অন্নগ্রহণ বাধ্যতামূলক। নচেৎ সংবৎসর নতুন অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সেজন্য কোনো মাহালি পরিবারে সেদিন অবধি মাঠ থেকে নতুন ধান ঘরে না উঠলেও যে কোনো উপায়ে নতুন চাল সংগ্রহ করে অন্ন প্রস্তুত করতে হয়। নতুন চালের পায়েস এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন-সহযোগে আত্মীয়-কুটুম আপ্যায়নের প্রথা রয়েছে এই দিনটিতে।

সূর্য্যিপূজা বা পুষানি—পৌষ সংক্রান্তির দিন পালনীয় এই পূজায় (পূর্বদিন আতপ চালে হবিষ্যান্ন ভোজনীয়) ভোরবেলা পুকুর বা নদীতে স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে পুলি পায়েস প্রস্তুত করে সূর্যদেবের উদ্দেশে ফুল-ফল-গোরে সিঁদুর প্রভৃতি প্রাঙ্গণে নিবেদিত হয়। এই পূজার একটি বিশেষত্ব হল কুমারী পূজা। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত পঞ্চকুমারীকে প্রাঙ্গণে বসিয়ে পিঠে-পুলি-পায়েস নিবেদন ও ভোজন করানো হয়। তাদের পদযুগলে সিঁদুর লেপন করে পূজা করা হয়। কুমারী কন্যা আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী অলৌকিক শক্তি (mana) তথা অতিরিক্ত আত্মাবস্তু সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। তারা Fertility cult-এর সাথেও সরাসরি যুক্ত। তাই তাদের আরাধনার মাধ্যমে সেই অদৃশ্য রহস্যময় শক্তিকে তুষ্ট করে সগৃহে ও পরিবারে উৎপাদন ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি সম্ভব। 'সূর্য' সৃষ্টির আদি উৎস, সেই সৃজনশীলতাই সঞ্চারিত হয়ে গৃহস্থকে সমৃদ্ধ করবে বলে আদিম বিশ্বাস। এই উৎসব মাহালিদের ঘরে ঘরে হয়। এই সময় আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে (মালদহ) মেলা হয়।

ওরাওঁ

কারাম—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতেই ওরাওঁ সম্প্রদায় 'কারাম' ব্রত করে। এই দিনটিতেই নাকি তারা প্রথম 'কারাম' পূজা করেছিল, তাই একে বলা হয় 'রাজীকারাম' বা 'দেশকারাম'। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই মূল কারাম ছাড়াও আরো অন্তত দুই প্রকার কারাম পাওয়া যাচ্ছে। একটি হল জিতিয়াকারাম, অন্যটি দাসাইকারাম। কারাম যুথবদ্ধ উৎসব, কোনো দল যে কোনো এক প্রকার কারামই করতে পারে উপরোক্ত তিনটির মধ্যে থেকে। জিতাকারাম বা জিতিয়াকারাম অবশ্য জিতাষ্টমীর দিন সন্তানের মায়েরা করে সন্তানের মঙ্গলকামনায়। 'তিনভাই তিনবোন' উপবাস করতে পারে, নিয়মপালন করতে পারে, কারাম ডাল কেটে

স্থাপন করার অধিকারও তাদের রয়েছে, কিন্তু পূজা করবে শুধু মায়েরা। অন্যদিকে 'দাসাই কারাম' হয় দূর্গাপূজার সময় নবমী তিথিতে। এটি মূল কারামের অনুরূপ।

মূল-পূজার পাঁচদিন বা সাতদিন আগে থেকেই চলে পূজার প্রস্তুতি অর্থাৎ জাওয়া জাগা। আমনধান কাটবার পরে ওরাওঁরা যেমন খামারী পূজা করে তেমনি জমিতে বীজ-বপন সমাপ্তির পরেই শুরু হয় 'কারাম'। কারাম পূজা করলে ধান ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলেই ওরাওঁদের বিশ্বাস। ভাদ্রমাসে চাঁদ দেখার পর থেকেই ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীতের প্রস্তুতি নিতে অনুশীলন শুরু করে। মূল-পূজার পাঁচ-দিন বা সাত-দিন আগে মাটির সরায় ভুট্টা, গম, যবের বীজ-রোপণ করে ব্রতীরা। কুরুখ ভাষায় একে বলে 'বীজদা লাগ্নো'। কারাম পূজায় অনেক ব্রতী থাকলেও মূল ব্রতী থাকে তিনজন, তদনুযায়ী মূল তিনটি ডালায় 'বীজদা লাগ্নো' করা হয় প্রধান রূপে। সেইসঙ্গে অন্যান্য আরো ডালা থাকতে পারে অন্য ব্রতীদের। প্রতিদিন হলুদ জল দিয়ে সন্ধ্যায় মাদল-যোগে নৃত্যগীতে মেতে ওঠে ছেলেমেয়েরা। মূলপূজার দিন করম ডাল ভাঙার পূর্বে তেল সিঁদুর লেপন করে পূজা দেওয়া হয়। যুবতীদের অধিকার নেই করম ডাল কর্তনের, সে অধিকার যুবাদের। ডাল কাটার পূর্ববর্তী দিন অর্থাৎ মূল পূজার আগের দিন পছন্দ করা নির্বাচিত ডালটিকে পাশাপাশি প্রত্যেক ওরাওঁ পাড়া থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত ও সংরক্ষিত করে রাখা হয়। পরদিন সন্ধ্যায় সবাই মিলে গীতবাদ্যসহ নাচতে নাচতে গিয়ে করমডাল কেটে পুনরায় নাচতে নাচতে ফেরে। মাঝপথে যুবকদের হাত থেকে যুবতীরা ডালটি নিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে। ডালপূজা ও কারাম খেসা শুনে (সাধারণত গ্রামের মোড়ল বা কাহিনি জানা বৃদ্ধ ব্যক্তি) খাওয়া দাওয়ার পর সারারাত নাচগানের মাধ্যমে কারামকে জাগিয়ে রাখা হয়। সূর্যোদয়ের সময় ডাল বিসর্জনের পর স্নান করে ভিজে বস্ত্রের কোঁচায় শশা বেঁধে নাচগান করা হয় পুনরায়। তারপর প্রসাদ বিতরণ করে বাড়ি বাড়ি চাল ডাল সবজি সংগ্রহ করে আনন্দ ভোজনে সবাই মাতোয়ারা হয়। প্রত্যেক গৃহ থেকে বিসর্জনের পূর্বে করমডালকে আতপচাল ও সিঁদুর-যোগে চুমানো হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে কারাম পূজার সময় ব্রতীদের নৈবেদ্য থালায় যে শশা থাকে কিম্বা পরদিন কোঁচায় যে শশা বাঁধা থাকে তাকে ঘিরে ওরাওঁদের মধ্যে একটি সরল বিশ্বাস রয়েছে, তারা কারামের কাছে প্রার্থনা করে তাদের কন্যারা যেন শশার মত সুন্দরী হয়। সেজন্য ত্যাড়াব্যাঁকা শশা তারা কখনোই কারামকে নিবেদন করে না। বোঁটাযুক্ত সরল ঋজু চিকন শশাই একমাত্র নিবেদিত হয়।

গোহালী পূজা—কালীপূজার পরদিন অমাবস্যা গত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই ওরাওঁ সমাজে শুরু হয়ে যায় গোহালী পূজা। অমাবস্যা রাতে গরুর শিং-এ তেল লেপন করে গোয়াল ঘরে সারারাত মৃন্ময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে অশুভ শক্তির উপদ্রব থেকে তাদের জীবনধারণের পরম সহায় এই জীবটিকে রক্ষার জন্যই অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা। পরদিন অমাবস্যা গত হলে গরুকে সযত্নে স্নান করিয়ে গোয়ালে রাখা হয়। তারপর তেলসিঁদুর-যোগে বরণ করে, গলার পুরানো রশি খুলে নতুন রশি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। কেউ কেউ ইচ্ছানুযায়ী কিম্বা পূর্ববর্তী কোনো মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সংকল্পানুযায়ী কালো বা লাল মুরগী বলি দিয়ে তাতে আতপচাল-ডাল-বাদামযোগে বিনা হলুদে খিচুরী রন্ধন করে

থাকে। আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশী ঘুরতে এলে তাদের এই খিচুড়ী-প্রসাদ পচানীসহ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনেকে বলির পরিবর্তে ফলমিষ্টির ডালা দিয়ে পূজা করে। এদিন নৃত্যগীতে ওরাওঁ পল্লীগুলি মুখরিত হয়ে ওঠে।

'ঝাণ্ডিপূজা' বা 'জাতেরা' বা 'যাত্রা'—গোয়াল পূজার পরের দিন অর্থাৎ কালীপূজার দু'দিন পরে ঝাণ্ডিপূজা অর্থাৎ পতাকাপূজা হয় একে 'যাত্রা' বা 'জাতেরা' পূজাও বলে। এই 'ঝাণ্ডা' হনুমানের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে হনুমান পূজা নয়। এ ওরাওঁ সম্প্রদায়ের অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়কে পুনঃস্মরণ। যারা গোহালিপূজা করে না কিম্বা যাদের গোত্রে বংশ পরম্পরায় 'যাত্রা'-পূজার প্রচলন রয়েছে, এই পূজায় অধিকার কেবল তাদের। গৃহ প্রাঙ্গণে লাল 'ঝাণ্ডা' স্থাপন করে সেই ঝাণ্ডাকেই ধুপ, দীপ, সিঁদুর, ফলমূল দিয়ে পূজা করা হয়। পূজা সমাপনে ঝাণ্ডার সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলা হয় 'বোল্ গে মুরগী কোক্‌রো চ'। ওরাওঁদের বিশ্বাস যে, একথা উচ্চারণের সাথে সাথে ঝাণ্ডির ওপর আজো নাকি শ্রুত হয় মুরগীর বোল্। ঝাণ্ডিপূজা উপলক্ষে ওরাওঁ উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির মাঠে মাঠে বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়, এই মেলা 'হুরহুরিয়া' মেলা নামে পরিচিত। হুরহুরিয়াতে এই জাতেরা গানের শেষে 'হুর্‌র্‌র্' ধ্বনি সম্মিলিত পুরুষ কণ্ঠে সজোরে উচ্চারিত হয়। সেজন্যই এই নামকরণ। ছেলেরাই মূলত গান করে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নৃত্য করে। ওরাওঁদের প্রাচীন কালের বীরত্ব ব্যাঞ্জক গৌরবময় ঐতিহ্য 'যাত্রা' পরবের মূলে ক্রিয়াশীল।

খামারী পূজা—মাঘ মাসে আমন ধান গৃহে ওঠার পর সকলে মিলে একটি দিন স্থির করে 'খামারী পূজা' করে। নতুন শস্য গোলাজাত বা খামারে তোলার আনন্দে এই উৎসব। এদিন আত্মীয়স্বজনকে অবশ্যই গৃহে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাড়ায় কারো গৃহে বিবাহানুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকলে তা এইদিনেই আলোচিত হবে, তার আগে নয়। কখনো কখনো বিবাহের সম্বন্ধও এদিন স্থির করা হয়। খামারী পূজার দিন খেতের কাজ, ধান তোলা এমনকি পূজারও কোনো কাজ রাখা হয় না। এটি সম্পূর্ণ অবসর-যাপনের দিন, কর্মহীন স্বস্তির আনন্দোৎসবে দেহমন সঁপে দেয় ওরাওঁ আদিবাসী। গ্রামীণ জীবন ও সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে এদিন আলাপ-আলোচনার আসর জমে, প্রত্যেক ওরাওঁ গৃহ আত্মীয়-কুটুম্বে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষে পচানি পান এবং সুস্বাদু ব্যঞ্জন ভোজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় খামারী উৎসব। বিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলিতে খামারীর অনুরূপ 'সরহুল' পরব খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু মালদহে 'খামারী' পূজার রমরমা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

হোলি—ফাল্গুন মাসে হোলি পরবে ওরাওঁ সম্প্রদায় খুশীর আনন্দে মেতে ওঠে। পূর্ণিমার আগের দিন কাদামাটি দিয়ে হোলি খেলা হয়। পরদিন আবির এবং রঙীন বর্ণে সকলকে রাঙানোর খেলা চলে। খেলা শেষ হলে সন্ধ্যায় পচানি, খাওয়া-দাওয়া আর ডিগা-মাদল যোগে চলে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান। আদিবাসী সম্প্রদায় অবসরের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে নৃত্যগীতিকেই মুখ্য ও ব্যাপকভাবে নির্বাচন করেছিল, একবিংশ শতকে পৌঁছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তনের পরেও সেই রুচির এবং শিল্পপ্রিয় স্বভাবের যে বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি, এই নৃত্যগীতিমুখর মুহূর্তগুলি সেকথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডাণ্ডাখাণ্ডা বা ডাণ্ডাখানা পূজা—ওরাওঁ সমাজে 'ডিম' এবং 'চিরচিট্টি' (বিশেষ ধরনের ছোট কাঁটাগাছ) অত্যন্ত পবিত্র ও শুভবস্তুরূপে গণ্য হয়। তারা বিশ্বাস করে 'ডিম' থেকেই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা। চিরচিট্টি ফুলকে ওরাওঁ মহিলারা নজরকাঠিরূপে খোঁপায় গুঁজে রাখে। উনানের লাল বা কালো মাটি যা দিবারাত্র ব্যাপী আগুনে দগ্ধ হয়ে জীবাণুমুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে আতপ চালও ওরাওঁ সমাজে অত্যন্ত পবিত্র। এই সমস্ত পবিত্র উপাদান সহযোগে ওরাওঁ উপজাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান-অনুষঙ্গে বৎসরে একাদিক্রমে পালনীয় পূজা হল 'ডাণ্ডাখাণ্ডা'। গৃহকে যে কোন অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে, শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনে, যেমন—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-গৃহপ্রবেশ-গোহালীপূজা-খামারীপূজা উপলক্ষে বহু আত্মীয়-পরিজনের পাশাপাশি অজানা ব্যক্তিরও গৃহে আগমন ঘটে বলে গৃহশুদ্ধি ও শান্তিস্থাপন করে গৃহকে অশুভ প্রভাব মুক্ত করতেই 'ডাণ্ডাখাণ্ডা' পূজা। এটি সাধারণত গৃহের অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিই করে থাকেন। এই পূজানুষ্ঠানের সময় নিয়ে বাধ্যবাধকতা বা কোনো নির্দিষ্ট বিধি নেই, তবে দুপুর বারোটার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই সাধারণত প্রশস্ত সময় মনে করা হয়। প্রথমে গোবর দিয়ে ঘরবাড়ি, গৃহাঙ্গন লেপন করে উনুনের পোড়া কালো মাটি, লালমাটি, সাদা আতপচাল গুঁড়ো দিয়ে লতাপাতা বা ফুলের আলপনা কেটে একটি সিঁদুর মাখানো ডিম স্থাপন করে ধূপসহ পূজা করা হয়। ডিম স্থাপনের সময় যে মন্ত্রটি বলা হয় সেটি নিম্নরূপ—

উঠসে গুরু সোনে সিক্কার লাগালেক কেওয়ার
দিয়া বারো সোনে সিক্কার লাগালেক কেওয়ার।

চিরচিট্টি গাছের ডাল ডিমের ওপর রাখা হয়, কুলোয় থাকে আতপচাল। চিরচিট্টি কাঠিতে মন্ত্র পড়ে গৃহকর্তার বংশ গোত্র ও পূর্বপুরুষের নাম স্মরণ করে তিনবার অথবা পাঁচবার ঘর্ষণ করে হাতের বিশেষ ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সম্মুখে। এই কাঠির পতনের ভঙ্গিটিই ভবিষ্যৎ নির্দেশক। অর্থাৎ কাঠি 'চিৎ' হয়ে পড়লে 'শুভ' এবং 'পাত' হলে 'অশুভ'। এবার কাঁঠাল পত্রে প্রস্তুত বাটিতে ডিম ফাটিয়ে তাতে আতপচাল দেওয়া হয়। ওরাওঁ পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান পবিত্র 'নাগপুরে'র নামোচ্চারণ করে সম্মুখস্থ চাল বারবার কুলায় ফেলা হয়। ডাণ্ডাখাণ্ডা পূজায় মহিলাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। সম্পূর্ণ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পূজা এটি। যাই হোক, এরপর ফেটানো ডিম ও চাল মিশ্রিত বাটি 'আখা'র (উনান) আগুনে সেদ্ধ করে প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয় সকলের মধ্যে। ডিমের খোলাটি ফেলা হয় না। সেটি দরজার ওপর চালের নীচে গুঁজে দেওয়া হয়। অশুভ শক্তি নাশ করার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে 'পবিত্র ফল ডিম'-এ। এই ডাণ্ডাখান্ডা পূজার সময় তারা যে সৃষ্টিসঙ্গীতটি গায়, সেটিও চমৎকার, বাস্তব ও কল্পনার আলোছায়ায় রহস্যময় পৌরাণিক উপাদানে সমৃদ্ধ এই গান।

নির্বাচিত আদিবাসী সম্প্রদায় আচরিত বিবিধ পূজানুষ্ঠান ও তদনুসারী উৎসব এগুলির ঐতিহ্যবাহী অন্তর্নিহিত মর্মসত্যকে স্পষ্টতই চিহ্নিত করে। **প্রথমত**, আদিবাসীদের মধ্যে পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার চল নেই, **দ্বিতীয়ত**, আদিবাসী পূজানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনো ভূমিকা নেই। গোষ্ঠীপ্রধান এবং গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত নরনারীই সাধারণত অনুষ্ঠানে ভূমিকা নেয়। **তৃতীয়ত**, আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবনা ও আচার অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির

তুলনায় অনেক বেশী জীবনমুখী। জীবন ধারণের বাস্তব উপকরণের সঙ্গে গোষ্ঠী-কল্যাণ ও সংঘবদ্ধ সমাজ রক্ষার ভাবনা, সর্বোপরি খাদ্য-সংস্থান ও কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে তা নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কোনো অনুষ্ঠান বাহ্য-আরোপিত নয়, জীবনের সঙ্গে স্পষ্টতই সম্পৃক্ত, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। ধর্ম ও কর্ম তাদের সামগ্রিক জীবনবৃত্ত রচনা করে, ধর্ম ও কর্ম সেখানে পরস্পরের পরিপূরক। **চতুর্থত,** আদিবাসী দেবদেবী চিরপরিচিত প্রাকৃতিক উপাদানে গড়া। কিম্বা বলা যায়, প্রকৃতিই ঐশ্বরিক শক্তিরূপে আবির্ভূত, যেমন—বৃক্ষ, শিলা, সূর্য, গবাদি পশু ইত্যাদি। কষ্টকল্পিত বিমূর্ত ভাবনার পরিবর্তে বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত অতিসাধারণ ও সুপরিচিত সহজলভ্য উপাদানই পূজ্যবস্তুরূপে দেখা দিয়েছে। **পঞ্চমত,** পূজার ব্যবহার্য উপকরণসমূহ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত, সহজলভ্য। **ষষ্ঠত,** পূজার প্রতিটি অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্মে ব্রতী নরনারীর অন্তরের কামনা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। সে কামনা নির্বিঘ্ন জীবনধারণ ও অস্তিত্ব রক্ষার কামনা। যান্ত্রিক ও কৃত্রিম আচার এসমস্ত অনুষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। **সপ্তমত,** যেকোনো পূজায় 'বলি' দেবার প্রথা ও বলির মাংস-যোগে খিচুরীভোগ বিতরণ আদিবাসীদের মধ্যে খুব প্রচলিত ও জনপ্রিয়।

পূজাপার্বণ কেন্দ্রিক অসংখ্য গানের মধ্যে যেমন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি নিজেদের সৃষ্টি-ইতিহাস, Myth বা পুরাণ কথা স্মরণ করেছে, পাশাপাশি পূজা-পদ্ধতি, কামনা ও বিশ্বাসের ভাষিক চিত্র প্রচুর গানে অভিব্যক্ত হয়েছে। সংগৃহীত গানগুলিকে পূজা-পার্বণের সামগ্রিক ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে ভাষিক পাঠ গ্রহণ করলে তাদের প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য বহুমাত্রিক রূপরেখার ধরা দেবে।

আদিবাসী কর্মজীবন ও সঙ্গীত

একদা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যে ভরপুর বঙ্গভূমি সম্পর্কে মধ্যভারতে একটি প্রচলিত মন্তব্য ছিল—বাঙলায় যারা আসে তারা ফিরে যায় না। (There is only way in and no way out of Bengal) বঙ্গভূমির অফুরন্ত কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, প্রাণীসম্পদ অনার্য আদিবাসীদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করেছে প্রাচীনকালে। কিন্তু আর্য অনুপ্রবেশের পর থেকে সেই চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সাম্প্রতিক কালেও অত্যন্ত শোচনীয় ও দুর্দশাগ্রস্থ। সমাজের অপরাপর সম্প্রদায় থেকে এই অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌বর্তীতার মূল কারণ শিক্ষার অনগ্রসরতা, সমকালীন পারিপার্শ্বিক অগ্রবর্তী সমাজের সাথে বিচ্ছিন্নতা এবং সরকারি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়ণের আংশিক ব্যর্থতা। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তযোগে সামগ্রিক মূল্যায়ন যেহেতু অবান্তর অযৌক্তিক, সেকারণে সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত অবস্থাপন্ন আদিবাসীর সঙ্গে সমগ্র গোষ্ঠীর সমীকরণ অসম্ভব। মূল গোষ্ঠীর বৃহত্তর সুসংহত জীবনধারার সঙ্গে এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিত আদিবাসীর পরিমার্জিত আধুনিকীকৃত জীবনধারা কোথাও আংশিক, কোথাও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন সংস্রবহীন। এখনো পর্যন্ত বৃহত্তর আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির প্রধান অর্থনৈতিক সংস্থানের মাধ্যমগুলি হল—খাদ্যসংগ্রহ, কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার, হস্তশিল্প, শিকার ও পশুপালন। এছাড়া মৃত্তিকা খনন, ইঁটভাটায় শ্রমিকের পেশাতেও কিছু অংশ লিপ্ত। সাম্প্রতিককালে অনেকে উচ্চসম্প্রদায়ের বিবাহাদি উৎসবানুষ্ঠানে নাচ-গান-অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের সাংস্কৃতিক শিল্পকলা প্রদর্শনের দ্বারা অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ক্রমান্বয়ী ধারাবাহিক রূপটি (সংগ্রহমূলক অর্থনীতি-সাংস্কৃতিক যাযাবর অর্থনীতি-স্থায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি-নগর অর্থনীতি-মহানগর অর্থনীতি) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্ট হয় সাম্প্রতিককালের মানচিত্রে। এখন আমরা খুব সংক্ষেপে নির্বাচিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক চালচিত্র ও সঙ্গীতের আধারে তার প্রতিফলিত রূপচিত্র আলোচনা করব।

সাঁওতাল উপজাতির প্রধান পেশা কৃষিকাজ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমভাবে নিজের অথবা অন্যের জমিতে ক্ষেতমজুর খাটে। পাশাপাশি বনজ ফলমূল, মধু, মোম, শালপাতা, ইত্যাদি আহরণ এবং পশুপালনের কাজও চলে। তবে 'শিকার' করার ক্রমহ্রাসমান ঐতিহ্য এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। নিয়মিত পেশারূপে যারা শিকার ত্যাগ করেছে, তাদেরকেও 'সহরায়' পরবের শেষদিন 'সাকরাত' বা শিকারে যেতে হয়। বছরে অন্তত একটি দিন ঐতিহ্যপূর্ণ অধুনালুপ্ত জীবিকাটিকে পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে স্মরণ করে সাঁওতালরা। এছাড়া গৃহে মুরগী, পায়রা, শুকর প্রতিপালন এবং খাল-বিলে মৎস্যশিকার তাদের প্রিয় বৃত্তি। পূর্বে

অবশ্য তাদের বারোটি গোত্রে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট কৌলিকবৃত্তি ছিল। যেমন—লোহার জিনিস ও মাদল-নাকড়া প্রস্তুত-করণ (হাঁসদা ও টুডু), পৌরোহিত্য (মুর্মু), রাজপাট পরিচালনা (কিস্কু), কৃষিকার্য (মার্ডি), দেওয়ান ও নায়কি (হেমব্রম), ব্যবসা (বাস্কে), সৈনিক (সোরেন) এবং নানাবিধ সাধারণ কাজকর্ম (বেসরা, চঁড়ে, পাউরিয়া)। আধুনিক যুগে এই চিরাচরিত রীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হতে বিশেষ দেখা যায় না। বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে উচ্চপদস্থ কর্মীরূপে বহু সাঁওতাল নরনারী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতালরা যে শুধু সংখ্যাগুরু তা নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও তারাই সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী।

গবেষক Herbert Hope Risley মনে করেন অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর মুণ্ডারি শাখার অংশ কোরা উপজাতি মূলত স্বতন্ত্র জীবিকার তাগিদেই মূল শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। Risley সাহেব কোরাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন যা মাহালিদের মতো পেশাভিত্তিক নয়, বরং স্থানভিত্তিক। ছোটনাগপুর থেকে বৃত্তিগত প্রয়োজনে মুঙ্গের, ধলভূম, মানভূম, হাজারীবাগ, ভাগলপুর অঞ্চলে বিস্তৃত কোরা সম্প্রদায় পরবর্তীতে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে। ধলভূম থেকে আগমনকারী 'ধলো', মানভূম থেকে 'মালো', শিকার অর্থাৎ বনাঞ্চল থেকে 'শিকারিয়া', সুবর্ণরেখা নদী সন্নিহিত স্থান থেকে 'সোনারেখা' ও ভবঘুরে বাউণ্ডুলে 'বাদামিয়া'। কোরাদের মূল পেশা মাটি খনন। তাদের মধ্যে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ—'কোরা মাটি খোঁড়া'। রাস্তাঘাট-পুকুর-বাঁধনির্মাণ বিবিধ প্রয়োজনে মাটি খননের পাশাপাশি কৃষিকাজও তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। খাল-বিলে মাছ ধরার কাজেও তারা লিপ্ত। বাঁশের তৈরি পোলোই, ডিঁরি ইত্যাদি নানাপ্রকার মাছ ধরার জাল, উলুখরের শিষ কেটে ঘরের ছাউনি, ঝাঁটা, খেজুরপাতার চাটাই প্রভৃতি নানাবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণে কোরা উপজাতি অত্যন্ত দক্ষ। শিকার যে একসময় তাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে বিবাহের মারোয়া নির্মাণে ধনুকের প্রতিমূর্তি ব্যবহারে, বিবাহোত্তর ক্রীড়ায় শিকারের অভিনয়ে ইত্যাদি। শিকার বৃত্তি কমে গেলেও এখনো তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখনো তারা খরগোশ, পাখি ইত্যাদি শিকার করে। গৃহে হাঁস, মুরগী প্রতিপালন করে।

'Tribes And castes of Bengal' গ্রন্থে Herbert Hope Risley 'মাহালি' উপজাতির শ্রেণীবিন্যাসে জীবিকাকেই কেন্দ্রীয় ভাবনা হিসাবে রেখেছেন। যেমন, ঝুড়ি-বাঁশের জিনিসপত্র প্রস্তুতকারী 'বাঁশফোড়' মাহালি, বাঁশের কাজের সঙ্গে কৃষিকার্যে সম্পৃক্ত 'পাতর' মাহালি, চাষবাস ও ক্ষেতমজুরি জীবিকাধারী 'সুলুংকি' মাহালি, পালকি-বাহকের বৃত্তিযুক্ত 'তাঁতি' মাহালি ও বাঁশের কাজ যাদের একমাত্র জীবিকা তারা 'মাহালি মুণ্ডা'। অনুমান করা হয়ে থাকে যে জীবিকাগত কারণেই তারা মূল 'মুণ্ডারি' শাখা থেকে বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। মাহালিদের মধ্যে নির্দিষ্ট জীবিকাহীন 'ওরাঁও মাহালি', 'কোল মাহালি'র প্রসঙ্গও জানা যায়। মাহালিরা গৃহে মুরগী, শূকর পালন করে। শুকরের মাংসকে তারা 'কালো খাসী' বলে, এটি তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। খাল-বিল-নদীতে মাছ ধরাও তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশা। তবে বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, শৌখিন জিনিসপত্র

যেমন—হাতপাখা, ঝুড়ি, কুলো, বাঁশের পাখি, ছাইদানী, ফুলদানী, মোমদানী, বাক্স প্রভৃতি তাদের অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয়বাহী। হাট-বাজারে-বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় এই সমস্ত হস্তশিল্প সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে মাহালি সম্প্রদায়ের নরনারীকে ব্যবসা করতেও দেখা যায়।

দ্রাবিড় শাখাভুক্ত ওরাওঁ সম্প্রদায় মূলত কৃষিজীবী। অন্যান্য জীবিকার মধ্যে পশুপালন, শিকার, মৎস্যশিকার, উল্লেখযোগ্য। খেজুর পাতার চাটাই, মাদুর, ঝুরি, কুলো, বিন্নার ঝাঁটা, নারকেল কাঠির ঝাঁটা প্রস্তুত ইত্যাদি কুটিরশিল্পেও তারা দক্ষ। পূর্বে ওরাওঁদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে শিকারের প্রচলন ছিল, এখনো কোথাও কোথাও শিকারের দেবতা 'শিকারভূতা' পূজিত হন, গৃহের নির্দিষ্ট কোণে। শিকার যাত্রার পূর্বে নাকি এই দেবতার পূজা করার নিয়ম ছিল, কাঙ্খিত শিকার লাভ এবং শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য থেকে অক্ষত দেহে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কামনায়। বর্তমানে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের নরনারী উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন চাকুরীক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সাঁওতালদের পরেই ওরাওঁদের অবস্থান বলা যেতে পারে।

আদিবাসী সঙ্গীতের উৎসমুখ তাদের কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শিকারের বিভিন্ন পর্যায়ের গান, মাছধরা ও পসরা সাজিয়ে মাছ বিক্রির গান, চাষের জমিতে জোঁকের উপদ্রব হাস্যমুখে সহ্য করেও জীবনের তাগিদে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে কৃষিকাজ করার গান—এসমস্তই আদিবাসী নরনারীকে কর্মজীবনের বহু বিচিত্র বাধা-বিঘ্ন জয়ের সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করে। এই গান বজ্র কঠিন জীবনসংগ্রামের মুখে এগিয়ে চলার প্রেরণা ও দুঃখজয়ী সুখজাগানিয়ার সঞ্জীবনী মন্ত্রস্বরূপ। কর্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে চিত্রিত নিয়তির অশুভ প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল জীবনছন্দ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার বহু অজানা ছবি সভ্যতার অপর প্রান্তস্থিত শহুরে অনভিজ্ঞ জনচিত্তে সঞ্চারিত করে অপার বিস্ময় ও কৌতুহল।

অতীতে শিকারজীবি আদিবাসী সম্প্রদায় শিকারযাত্রার পূর্বে হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে আত্মরক্ষা ও কাঙ্খিত শিকারপ্রাপ্তির তাগিদে আরাধ্য দেবতাকে পূজা দিয়ে যাত্রা করত। সাঁওতাল সঙ্গীতে (৪৩ সংখ্যক) 'দ্রিহিবাবা' ও 'গ্রোখাবাবা'কে স্মরণ করা হয়েছে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য। গানগুলি গীত হওয়ার সময় গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত সাঁওতাল কন্যারা দুরুম্‌জা নৃত্য করে। অপর দুটি গানের একটিতে (৮৪ ও ৮৫ সং) শিকারকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের বিদ্ধ করে, বড় দাদার ছোঁড়া তীরে অসাবধানতাবশত ছোট ভাই বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, অন্যটিতে নববধূ ভাশুরের কাছে অনাগত স্বামীর আগমন সংবাদ জানতে চেয়েছে। অরণ্যজীবনের ঝুঁকি, জীবনসংগ্রামের কাঠিন্য, কর্মক্ষেত্রে প্রিয়বিয়োগের বেদনা গানগুলিকে একাধারে রোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। সারাদিন বনজঙ্গলে ঘুরেও শিকার অধরা রয়ে যাবার হতাশাব্যঞ্জক চিত্র মিলেছে কোরা সঙ্গীতে (৪৩ সং)।

শুধু শিকার কেন, কৃষিকার্যেও কী বাধাবিঘ্নের অভাব রয়েছে? সেখানেও তো বিষাক্ত প্রাণী, পোকামাকড়, জোঁকের উপদ্রব—অথচ এসব হাসিমুখে উপেক্ষা করে চলতে হয় অপত্যস্নেহমগ্ন কোরা পিতামাতাকে (৪৪ সং)। চাষের জমির অপ্রতুলতাজনিত কারণে

অতিকষ্টে প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম ফসলটুকু উৎপাদন করতে পারে চাষী (কোরা, ৪৫ সং)। আবার, কোথাও জমির অভাব, তো কোথাও জলের; (ঐ) ১৬ সংখ্যক গানে চাষী কাঁদছে জলাভাবে চাষাবাদ বন্ধ বলে। মৎস্য শিকারের গানগুলিতে অবশ্য দুঃখ বর্ণনার পরিবর্তে লঘু হাস্যকৌতুকের মেজাজ—একটি গানে স্বামীস্ত্রীর যৌথভাবে মাছ ধরার চিত্র (ঐ, ৬৮ সং), অন্যটিতে মাছ ধরতে গিয়ে জালে কুমারী কন্যা ধরা পড়ার কৌতুককর বর্ণনা (৬৯ সং)। কোরাদের প্রধান জীবিকা মাটি খননকে কেন্দ্র করেও গান (২৩ সং, ৪২ সং) রচিত হয়েছে। কোরা যুবকের মাটি খনন ও কোরিন বা মেয়েদের মাথার উপর সুরকি বহনের বাস্তব প্রসঙ্গ গানের কথায় ধরা দিয়েছে। এই অক্লান্ত প্রাণান্তকর পরিশ্রম সত্ত্বেও পরিবারে আসে না সচ্ছলতা, দারিদ্রের করালছায়া যেন পিছু ছাড়তে চায় না। দাম্পত্য জীবনকেও কখনো-কখনো তা করে কলুষিত। (ঐ, ৬৫ নং) স্ত্রীর পরনে গোটাবস্ত্র ও সিঁদুর জোটাতে অক্ষম স্বামীর ঘর করতে অনিচ্ছুক কোরারমণীর চিত্র কোনো কোনো গানকে করেছে করুণ রসসিক্ত। কর্মজীবন এমনভাবেই নিয়ন্তা হয়ে ওঠে পারিবারিক সম্পর্কের ভারসাম্যরক্ষার ক্ষেত্রে, এই কঠিনসত্য প্রস্ফুটিত হয়েছে সঙ্গীতের আধারে।

ওরাওঁ সঙ্গীতেও দেখা যায় স্ত্রীর ইচ্ছা আবদার পূরণ করতে না পেরে স্বামী বিদেশে কর্মের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে। বেশ কিছু গানে এসেছে শিকারের প্রসঙ্গ। সেখানে রামায়ণ কাহিনির রাবণ-সীতা চরিত্রের অনুপ্রবেশও দেখা যায়, যেমন কোরা উপজাতির শিকারের গানে রয়েছে শকুন্তলা রাণীর প্রসঙ্গ। সাংস্কৃতিক বিমিশ্রনের বিপুল নিদর্শন রয়েছে এই সমস্ত গানে। বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যে আদিবাসী কর্ম-সঙ্গীতগুলির অনবদ্য ও অফুরন্ত আবেদন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

আদিবাসী জীবন ও সঙ্গীত : ঐতিহ্যে আধুনিকতায়

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত গ্রন্থে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কিত বহুপ্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে বলেছিলেন—'লোকসাহিত্যকে আমি কখনোই কেবল 'মৌখিক সাহিত্য' বলিয়া মনে করি না; ইহা যে সর্বদাই 'ঐতিহ্যমূলক' হইবে, তাহাও বিশ্বাস করি না, ব্যক্তিগতভাবে শত শত গান সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিয়াছি, অনেকেই গান লিখিয়া রাখিয়াছে বা লেখা-পড়া জানিবার দরুণ লিখিতভাবেই রচনা করিতেছে; এবং তাহার বিষয় নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনাও হইতেছে।' আসলে ঐতিহ্যের গভীরে লোকসাহিত্য-সঙ্গীতের শিকড় প্রোথিত থাকা সত্ত্বেও আধুনিকতার উন্মুক্ত আকাশে ভাবে-বিষয়বৈচিত্র্যে-বহুমাত্রিকতায় তার বিস্তার ঘটেছে সেই বাস্তবসত্যকে অস্বীকার করবার অবকাশ নেই, ড. ভৌমিকের এই মন্তব্য আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে আদিবাসী জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য ও সেকারণেই উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী সম্পর্কেও বহুচর্চিত ঊনিশশতকীয় ঔপনিবেশিক ধারণাগুলিকে বর্তমানের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দ্রুত অপসারণের সময় আগত। সেখানে আদিবাসীদেরকে 'Primitive stage of human social development' রূপে চিহ্নিতকরণের বৈষম্যমূলক প্রচেষ্টা চলে, 'homogeneous identity'র তক্‌মা দিয়ে তাদের বৈচিত্র্যময় ও জাতিসত্তাগত স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা হয়। পাহাড় জঙ্গলবাসী এবং সমভাষিকতার সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাদেরকে একমাত্রিকতায় চিহ্নিত করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা রুদ্ধ করার দিন আগত। কারণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আদিবাসী জীবনধারার নানা দিকে বিবর্তনের সূক্ষ্মরেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আধুনিক উন্নততর জনগোষ্ঠীর তুলনায় তাদের Primitivenes বা আদিমতা সেকারণেই তাদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের প্রধান ও প্রথম শর্ত হতে পারে না। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক গোত্র-বংশগত প্রভেদ, রয়েছে গ্রামীণ সমাজ তথা আঞ্চলিক পার্থক্য যা তাদের সমপ্রকৃতি ও অভিন্নতার তত্ত্বকে নস্যাৎ করে। সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে বসবাসকারী সমপ্রজাতির আদিবাসীর মধ্যেও পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি আচরণ ও জীবনধারাগত ব্যবধান তীব্র। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা আদিম একক বিন্দুতে স্থির নেই। প্রকৃতির আরাধনাকারী (animistic) আদিবাসীসমাজ পারিপার্শ্বিক উচ্চসংস্কৃতির প্রভাবে এবং স্বজাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে ক্রমবিলুপ্তির কঠিন সঙ্কট মোচনার্থে স্বধর্মে অবিচল একনিষ্ঠ থাকার পরিবর্তে বৃহত্তর ধর্মীয় বলয়ে সম্পৃক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করেছে নিজেদেরকে। এর মধ্যে হিন্দু এবং খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাধিক। হিন্দুধর্মের সঙ্গে আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মগত সাদৃশ্য ও নৈকট্যের শিকড় ইতিহাসের কৃষ্ণগর্ভে নিহিত। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ড. অতুল সুরের মতে, হিন্দুধর্মের বারো আনাই অনার্যদের কাছ থেকে

উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, চার আনা মাত্র আর্যদের কাছে প্রাপ্ত। উভয়ধর্মের নৈকট্য সেকারণে স্বাভাবিক। সম্ভবত এজন্যই দেখা যায়, হিন্দু ধর্মান্তরিত আদিবাসী সম্প্রদায় হিন্দু দেবদেবী পূজার্চনা করতে গিয়ে নিজস্ব আদি ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেনি, বরং নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতির হিন্দুকরণ প্রবণতা তাদের মধ্যে স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয়। যেমন—সাঁওতাল সমাজের আদি সৃষ্টিকাহিনী প্রায় অবিকৃত রেখে সামান্য কৌশলে মারাংবুরু, ঠাকুর-ঠাক্‌রাইন, লিটে গোঁসাই প্রভৃতি নিজস্ব দেবদেবীর সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছে হিন্দু দেবদেবী, যেমন—'গঙ্গামাই', 'ব্রহ্মা-নারায়ণ'। 'মারাংবুরু'র (আদি অর্থ 'মহাগিরি') আধুনিক পরিবর্তিত অর্থ মহাদেব, 'হিহিড়ি পিপিড়ি' পরিবর্তিত হিন্দু পৌরাণিক সংস্কারমিশ্রিত আদিবাসী কাহিনিতে পরিণতি লাভ করেছে 'কৈলাস পর্বত'-এ এবং করম গাছ পরিণত হয়েছে 'কল্পতরু'তে। 'কোরা' এবং 'মাহালি' সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 'করম' পূজার খেসায় বা কাহিনিতে স্থান পেয়েছে 'বিশ্বকর্মা'। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার পরিবর্তে 'বিশ্বকর্মা' পূজার দিনও তারা 'কারাম' বা 'করম' ব্রত করে। এসমস্তই সাংস্কৃতিক বিমিশ্রণের ফলশ্রুতি। এই বিমিশ্রণ বা Acculturation আধুনিকতার পথে অগ্রগতির প্রধান সংকেত। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী আদিবাসী সম্প্রদায় এমন নিখুঁত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খ্রিস্ট ও আদিধর্মের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে নি। এমনকি তারা খ্রিস্টধর্ম পালনের পাশাপাশি নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি স্বাধীনভাবে পালনের অধিকারী নয়। যেমন, পূর্বোক্ত 'কর্মা' (করম বা কারাম) আদিবাসী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দু ধর্মান্তরিতরা এখনও এই ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসবকে সজীব সচল রাখলেও খ্রিস্টানদের দ্বারা এটি পালনীয় নয়। তারা বড়দিন, নিউইয়ার ইভ, ইস্টার স্যাটারডে, গুড ফ্রাইডে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে থাকে। খ্রিস্টান আদিবাসীদের গৃহের বাইরের দেওয়ালে খোদিত বা অঙ্কিত হয় ক্রুশচিহ্ন। অন্যদিকে হিন্দু আদিবাসীর গৃহের দুয়ারসংলগ্ন দেওয়ালে (বাইরে) থাকে গোত্রচিহ্ন, ময়ুর, পদ্ম, লতাপাতার আলপনা। সুতরাং একই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক ধর্মীয় বিভাজনরেখা সৃষ্টি করেছে এক একটি অভিনব সাংস্কৃতিক উপবিভাগ। অবশ্য এই পার্থক্য এখন পর্যন্ত তাদের আন্তর্বিবাহে কোনো বাধা বা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেনি। অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে কিনা সেটা গভীর অনুসন্ধানসাপেক্ষ বিষয়। এ জাতীয় বিবাহে সাধারণত বিবাহিতা কন্যাকে স্বামীগৃহের ধর্মানুযায়ী চলতে হয়। শিক্ষিত শহুরে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে উদার ব্যক্তি স্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষিত চাকুরীজীবী অবস্থাপন্ন আদিবাসীরা কিছুটা সঙ্কীর্ণ হীনমন্যতায়, কিছু ক্ষেত্রে কর্মব্যস্ত অবসরহীনতার কারণেও নিজ নিজ গোষ্ঠীসংস্কৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। বরং আধুনিক বিশ্বায়ণের বৃহত্তর বিস্তৃততর সচল জীবনস্রোতের শরিক তারা। এই হিন্দু-খ্রিস্টান, সাক্ষর-নিরক্ষর, শহর-গ্রামের ভেদ স্পষ্টতই তাদের মধ্যে সূচিত করেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার বিমিশ্রনে বহুমাত্রিক আনুপাতিক পার্থক্য। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামীণ আদিবাসীরা যতখানি প্রাচীন ঐতিহ্যের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক, উচ্চসংস্কৃতি অধ্যুষিত শহর-শহরসংলগ্ন লোকালয়ের বাসিন্দা আদিবাসীদের মধ্যে তা প্রায় অনুপস্থিত, সেখানে প্রাচীন সংস্কৃতির আধুনিকীকরণ, পরিমার্জন ও সংক্ষিপ্তকরণের প্রবণতা

অনেক বেশি, ভাষাগত দিক থেকেও তারা পশ্চাদবর্তী আদিম বিন্দুতে স্থির থাকতে পারেনি। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে যেখানে সমপ্রজাতির আদিবাসীর বাস, সেখানে অনায়াসে নিজস্ব ভাষিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সক্ষম থেকেছে তারা। আবার এমন গ্রামীণ পরিস্থিতি রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস, সেক্ষেত্রে যে গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুব স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ওপর গভীরতর প্রভাব ফেলেছে। মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শহুরে শিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যে নব্য আর্যভাষার চর্চাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তবে, সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীই ভাষাগত দিক থেকে বর্তমানে দ্বিভাষিক বা 'Bilingual' যারা পরিবারে নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষায় ভাববিনিময় করে, কর্মক্ষেত্রে তাদেরকেও স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে হয়। আবার, যারা বিচ্ছিন্ন ও সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ফলে নিজস্ব মাতৃভাষাকে অক্ষত রাখতে পারেনি তারা মিশ্রভাষা সাদরীতেই ভাবের আদানপ্রদান করে। সুতরাং ভাষিক দিক থেকেও ঐতিহ্যের স্বীকরণ ও আধুনিকতার সাঙ্গীকরণ দুয়ের মিলিত রসায়ণে বিবর্তমানতার অনিবার্য পথে অগ্রসরমান আদিবাসী সম্প্রদায়।

সংগৃহীত সঙ্গীতগুলির মধ্যে আদিবাসী জীবনে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার নবতর বিন্যাস বিষয়বৈচিত্র্যে চিহ্নায়িত, সমান্তরালভাবে ভাষিক লক্ষণেও প্রতিফলিত। মালদহ জেলায় ওরাওঁ সম্প্রদায় বৃহত্তর আদিবাসী গোষ্ঠীরূপে অবস্থানের কারণে তাদের মাতৃভাষা কুরুখ এখনো কথোপকথনে ও গানে রক্ষিত, অবিমিশ্র কুরুখ ভাষায় বহু গান এখনো অবিকৃতরূপে পাওয়া গেছে। পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশীরূপে এখানে অবস্থান করেছে আরেক বৃহত্তর আদিবাসী গোষ্ঠী 'মুণ্ডা'। ফলে ওরাওঁদের বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীত বহু গানে মুণ্ডারি ভাষা অনুপ্রবেশ করেছে, এমনকি তাদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান-পরবে অবিমিশ্র মুণ্ডা গানও অনায়াসে গৃহীত হয়েছে। উৎসগত বিচারে ওরাওঁ সম্প্রদায় দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং মুণ্ডা সম্প্রদায় অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। অথচ তাদের মধ্যে এই পারস্পরিক ভাষা ও সংস্কৃতিগত আদানপ্রদান বিস্ময়কর। সাঁওতাল সম্প্রদায় এ অঞ্চলের বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠীরূপে নিজস্ব ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। সামান্য যে ক'টি গানে ভাষাগত অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেটি স্থানীয় বাংলা ভাষার প্রভাব জনিত। গানের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক চিত্র অভিব্যক্ত তাও সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব নয়, সামান্য হলেও অন্য সংস্কৃতির বিশেষত হিন্দু ভাবধারার প্রভাব স্পষ্ট, সেকথা যথাস্থানে আলোচিত হবে। কোরা এবং মাহালি সম্প্রদায়ের ভাষা তার নিজস্ব ধর্ম বা প্রকৃতি অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে, তার অভ্রান্ত প্রতিফলন ঘটেছে তাদের গানগুলিতে। বিষয়গত দিক থেকে যে গানগুলি ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, সেগুলি মোটামুটিভাবে আদিরূপটি অবিকৃত রেখেছে। অনেকসময় গানের অপরিবর্তিত আদিরূপটির বাস্তব অনুসৃতি পরিবর্তিত আধুনিক প্রথায়-আচারে খুঁজে পাওয়া যায় না, ফলে গানের সেসমস্ত অংশের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া রীতি আচারের প্রত্নরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব। বেশ কিছু গানে আদিবাসীদের সৃষ্টিকাহিনি সুরে-ছন্দে-ভাষায় মূর্ত হয়েছে, আবার বিলুপ্তপ্রায় রীতিনীতি, এমনকি দেব-দেবীর নাম ঐ গানগুলির মাধ্যমে বেঁচে রয়েছে। এই গীতিগুলির সাহায্যে ঐতিহাসিক পুনর্গঠন (historical reconstruction)

সম্ভব। শুধু অধ্যাত্ম বিশ্বাস ও আচার-প্রথার প্রত্নরূপ নয়, আদিবাসী গোষ্ঠীর সহজ-সরল প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা, পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের আবেগপূর্ণ আর্তি এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির বহুমাত্রিক প্রতিফলন ও প্রকাশ দেখা যায় গানগুলির ছত্রে ছত্রে।

আদিবাসী সঙ্গীতগুলি তাদের গোষ্ঠীজীবনের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে, জাতিসত্তাগত পৃথক বৈশিষ্ট্যসমূহকে স্পষ্টতররূপে চিহ্নায়িত করে। যেমন, একটি বিশেষ ব্রতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত স্বতন্ত্র রীতি ও উদ্দেশ্য যে বিচিত্র তরঙ্গে আবর্তিত হয় তারও উৎকৃষ্ট নিদর্শন হতে পারে গানগুলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মাহালি সম্প্রদায়ের একটি কর্মাগানে কর্মার অশ্বারোহনে আগমনের তথ্য মেলে, তাদের কারাম পূজায় অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত কর্মার একটি মৃন্ময়মূর্তি স্থাপিত হয়। গানের মধ্যেও এর উল্লেখ তাদের বিশেষ এই ধারণাকে বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তিদান করে। অন্যদিকে, কোরা সম্প্রদায়ের একটি গানে পাই কর্মা আসছে হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে। তাদের কর্মাপূজায় কর্মার কোনো মৃন্ময়মূর্তি থাকে না। কর্মার বাহন যেভাবে বিশ্বকর্মার বাহনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল সেটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও রহস্যজনক। 'কোরা' সম্প্রদায়ের কর্মা 'খেসা'য় বা কাহিনিতে বিশ্বকর্মার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আরেকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, 'কর্মা', 'করম' বা 'কারাম' আদিতে মূলত উর্বরতামূলক শস্যোৎসব হলেও 'মাহালি' ও 'কোরা' সম্প্রদায়ের মধ্যে একে ঘিরে বাঙালী হিন্দুর আগমনী-বিজয়া গানের অনুরূপ ভাই-বোনের চিরন্তন প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক অনির্বচনীয় ভাষারূপ প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইবোনের অবিচ্ছেদ্য প্রীতি, বিচ্ছেদজনিত বেদনা এই ব্রতকে ঘিরে কখনোই প্রকাশ পায়নি, ফলে গানের মধ্যেও তার কোনো প্রতিফলন নেই। সাঁওতাল উপজাতির 'করম' ব্রতের রীতি-অনুষ্ঠানে সৃষ্টি কাহিনির ধর্মীয় অনুষঙ্গ অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। তাদের গানগুলিও এইকারণে অনেক বেশী অধ্যাত্ম অনুষঙ্গ আশ্রিত। 'কারাম' পরবের কথা ছেড়ে দিলে 'কেরাপূজা'র গানগুলিতে কিম্বা 'নামান' গানেও মন্ত্রগুণ সম্পন্ন বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী রূপ ও কাঠামোর নিদর্শন মেলে। এগুলিও যে আর্যপ্রভাব মুক্ত থাকতে পেরেছে সম্পূর্ণরূপে তা নয়। কোথাও কোথাও এসব গানে বৈদিক দেবী 'সরস্বতী'র উল্লেখ ও আরাধনা রয়েছে। তবে, সর্পদেবী মনসার উল্লেখ প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান।

বিবাহকেন্দ্রিক গীতিসমূহের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-প্রথা সমূহ, নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীগত বিপুল ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। বিবাহানুষ্ঠানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আচরিত প্রায় প্রত্যেকটি পর্যায়ের রীতিনিয়মের আনুষঙ্গিক গীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই সুলভ। বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গরূপে গানগুলি আদিবাসী সমাজে অত্যন্ত প্রাণবন্ত। পাশাপাশি, এই গানগুলির মাধ্যমেই বিবাহের আনুষঙ্গিক অজস্র সংস্কারসমূহ আজও তাদের প্রাণসত্তাকে বহন করে চলেছে। অর্থাৎ সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও এইসমস্ত প্রাচীন রীতিনীতি ও গীতিসমূহ আধুনিক কালে অক্ষুণ্ণ ও অমলিন রয়ে যাবার অন্যতম কারণ তাদের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দৃঢ়তা। আদিবাসী সমাজ ও জীবনের হারিয়ে যাওয়া অতীতকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এ সমস্ত সঙ্গীতরত্নের উজ্জ্বল আলোকে।

53

অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে চিরায়ত ঐতিহ্য, ধর্ম-প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার ব্যতিরেকে আধুনিক বিবিধ সমস্যা ও পরিস্থিতির বর্ণনাও বেশ কিছু আদিবাসী সঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। শিক্ষামূলক ও প্রতিবাদমূলক গানগুলি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিশেষত, শিক্ষামূলক গানগুলিতে আদিবাসী গায়কগণ যেন বহুক্ষেত্রেই স্বগোষ্ঠীরও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। আদিবাসী জনজাতির অনগ্রসরতা, পশ্চাদবর্তীতা, উন্নত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সমতালে স্বগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রয়াস ও ঐকান্তিক বাসনা এর পিছনে কার্যকরী। গানগুলির মুখ্য উপজীব্য স্বগোষ্ঠীর মানুষের নিরক্ষরতার জন্য আক্ষেপ এবং শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সেই অভিশাপ মোচনের প্রয়াসমূলক উপদেশ। এমনকি হাঁড়িয়াপ্রিয় আদিবাসী মাদক পানীয়ের ক্ষতিকারক দিকসমূহকে আধুনিক গানে তুলে ধরে তার বিরোধিতা করে হাঁড়িয়া-পচানি বর্জনের উপদেশ দিয়ে নিজ গোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলছে। পচানি বা হাঁড়িয়া শুধু মাদক পানীয়রূপেই আদিবাসীরা সেবন করে, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। পচানির একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথার অপরিহার্য অঙ্গরূপে। ধর্মপ্রাণ আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমপ্রসারিত বিবিধ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবোধ নিঃসন্দেহে আধুনিক জীবনদর্শনের পরিচয়বাহী।

মানবিক সম্পর্ক ও নান্দনিকতায় আদিবাসী সঙ্গীত

সংগৃহীত আদিবাসী সঙ্গীতগুলি আলোচনাসূত্রে এর অন্তর্নিহিত বিচিত্র বহুমাত্রিক মানবিক সম্পর্ক ধারার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। যদিও আদিবাসী গোষ্ঠী তথা সমাজজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মানবিক সম্পর্ক মূলত প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতিপ্রীতি ও ভীতি, প্রকৃতি আরাধনা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতি-নির্ভরতার সেই আদিম ঐতিহ্যের প্রতিফলন বহু সঙ্গীতের মধ্যেই ধরা পড়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের প্রকৃতি-নির্ভরতা ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কচিত্র খুব সঙ্গতভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বুকে স্বতন্ত্র মানব প্রজাতির উদ্ভব না হলেও প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একে একে এদেশে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ; আর্যপূর্ব সেইসব গোষ্ঠীর এদেশে স্থায়ী বসবাসের কারণ জীবনদায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত প্রাচুর্য। অস্তিত্ব রক্ষার্থে আদিম মানুষ প্রকৃতিতেই খুঁজেছিল সমাধান-সঙ্কেত, আশ্রয় ও আত্মীয়তা-বন্ধন। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ প্রকৃতিকে বহুক্ষেত্রে বশীভূত করে ফেললেও আদিবাসী সমাজ এখনো প্রকৃতির প্রতি তাদের ভক্তি বিনম্র কৌতূহল ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রকৃতিই তাদের সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক, শিল্পচেতনার উদ্‌গাতা। আদিবাসী সঙ্গীতের সিংহভাগ জুড়ে বিপুল সৌন্দর্যানুভূতি ও নান্দনিকতার মূলীভূত উৎসরূপটি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক সম্পর্কের গভীরে নিহিত। প্রাত্যহিক শ্রম ও সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন কঠিন বন্ধনের মাঝে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকেই তারা অনুসন্ধান করেছে বাঁধনহারা উচ্ছ্বসিত জীবনের পূর্ণতর অনুধ্যান, পবিত্র শুচিময় জীবনাদর্শ। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেই যথা— মহুয়া-শাল-করম-বট-পাকুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজি তাদের সীমায়িত জীবনে বৃহত্তর মহত্তর-পূর্ণতর আদর্শের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছে, এইসব বৃক্ষানুষঙ্গে রচিত অসংখ্য সঙ্গীতে তার পরিচয় রয়েছে। সুদীর্ঘ ও ঋজু শালবৃক্ষ আদিবাসী জীবনে সত্যের প্রতীক। তাত্ত্বিক বলয়ের বাইরে নিছক সৌন্দর্য সাধনারও কেন্দ্রবিন্দু প্রকৃতি। এর রূপ-রস-গন্ধের বিপুল ভান্ডার গভীর পর্যবেক্ষণে নিখুঁতরূপে ধরা দিয়েছে। প্রকৃতিতে অফুরন্ত রঙীন পুষ্পভাণ্ডার মুগ্ধনেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছে আদিবাসী মানুষ, আবার প্রস্ফুটনের রহস্যময়তাও তাদের কৌতুহলী মনকে করেছে আকৃষ্ট। আদিবাসী কোরা (৫১ সং) ও মাহালি (৮ সং) গানে সরল-সংক্ষিপ্ত ভাষা ভঙ্গিমায় ভোরবেলা শালুক ফুল, দিনের আলোয় সূর্যমুখী ও বনতুলসী, আঁধার রাতে বা সন্ধ্যাকালে ঝিঙেফুল ও 'কারলা'ফুল প্রস্ফুটনের সৌন্দর্যময় ক্ষণমুহূর্তটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ৬০ সংখ্যক সাঁওতাল গানে বড় ঝাড়যুক্ত বট ও পাকুড় গাছের নীচে আশ্রয় নেবার প্রসঙ্গ রয়েছে। ৭২ সংখ্যক গানটি চমৎকার। এখানে বলা হয়েছে যে লোগুবুরু পাহাড়ের ওপর থোকা থোকা মহুয়া ফুলে ছেয়ে গেছে, প্রচণ্ড

৫৫

বাতাসে প্রচুর ফুল ঝরে পড়ছে, কেউ মাথায় ডালি নিয়ে গেলে ঝরা ফুলেই ডালি পূর্ণ হবে। তেমনি শালফুলের প্রাচুর্য রয়েছে ঘন্টাবেড়িতে। ৪৭ সংখ্যক কোরাগানে রাত্রির স্নিগ্ধ রহস্যময় পটভূমিতে থোকা থোকা মহুয়াফুল ঝরে পড়া, আদিবাসী নরনারীর পরমানন্দে চরম স্ফুর্তিতে মুঠো মুঠো ফুল সংগ্রহ করে সুস্বাদু ভাজা কিম্বা সুরা প্রস্তুতের অতি সাধারণ ছবি জীবনরসের পরম উপভোগ তথা তুচ্ছপ্রাপ্তির মধ্যেও জীবনের পরিপূর্ণতা আস্বাদনের দুর্লভ ক্ষমতাকে মূর্ত করেছে যা শহুরে বিলাসবহুল মানসিকতার পাশে অত্যন্ত বৈপরীত্যময়। ৭১ সংখ্যক গানে (কোরা) মাঝনদীতে প্রস্ফুটিত শতদলের শোভা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা সম্ভবপর হয়, শুধু অব্যক্ত ইঙ্গিতেই তার উন্মোচন, ব্যঞ্জনাময় সেই প্রকাশ অপূর্ব। এই সমস্ত গানে উপমা, রূপক, সাদৃশ্য, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার আদিবাসী নরনারীর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার বার্তাবাহী। একটি কোরাগানে (২৮ সং) উড়ন্ত কাঁশিফুল বা কাশফুলকে সুদূর গগনচারী পক্ষীর সঙ্গে উপমিত করে শেষ পর্যন্ত কাশফুল ও পক্ষীর বিশেষ স্বভাবধর্মের সঙ্গে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে স্বামীগৃহে গমনোদ্যত কন্যার সাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে চমৎকার শিল্পকুশলতায়। কারাম ব্রতেরই আরেকটি গানে পূজান্তে বিসর্জনের আসন্ন বেদনা কারাম ডাল ও পরবেতি (ব্রতচারিনী) বোনের পারস্পরিক সাদৃশ্যে চূড়ান্ত বাণীরূপ ধারণ করেছে। ব্রতশেষে কারামডাল বিসর্জিত হবে নদীতে, তাকে পুনরায় দীর্ঘ একবছর নির্বাসিত হতে হবে বনে-জঙ্গলে, একইভাবে বোনকে প্রত্যার্পণ করতে হবে শ্বশুরগৃহে, তারপর সম্বৎসরের প্রতীক্ষা! সেকারণে ক্রন্দনরতা কারামডাল ও বোনকে নিরুপায় ভাই যথাক্রমে ধূপ-দীপ-ফুল-ফলে এবং দুধ-ভাতে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। গানটিতে কারাম ডালের ওপর মানবিক সত্তার আরোপ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও শিল্পসম্মত। কোনো কোনো গানে (কোরা, ৬৯সং) রূপকথার অলীক মায়াময় জগৎ প্রকৃতির পটে মূর্ত হতে দেখা যায়। মাছ ধরতে বসে জালে ক্রমাগত শ্যাওলা ও শামুক ধরা পড়ায় যুবক চিত্ত যখন ব্যাকুল ও আশাহত, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে জালে উঠে এল এক সুন্দরী কুমারী কন্যা। ব্যর্থ হতাশাগ্রস্ত জীবনে আশাতীত সাফল্য প্রাপ্তির সুখসপ্ন গানটির বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে। ওরাওঁ বিবাহসঙ্গীতে (৪৪ সং) বিবাহযাত্রী বরকে অভিভাবকরা সাবধানতার উপদেশ দিতে গিয়ে নদীর রূপকে জীবন ও মৃত্যুকে উপস্থাপিত করেছে। যাত্রাপথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আত্মরক্ষাতে অসমর্থ হলে মরাগঙ্গালাভ এবং সশরীরে ফিরলে প্রাপ্তি ঘটবে জীবনগঙ্গা। একটি সাঁওতাল গীতিতে (১০০ সং) যে উপমাটি উঠে এসেছে সম্‌ধিমিলন প্রথা সূত্রে সেটি সম্পূর্ণত তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পৃক্ত। গানটিতে বলা হয়েছে যে, ধান ছাড়া যেমন মুড়ি তৈরি করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে সন্তান না থাকলে, ছেলে-মেয়ে না থাকলে বেহাই সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব। প্রকৃতির খেয়ালখুশী আদিবাসী জীবনকে একাধারে আশাবাদী ও হতাশাগ্রস্ত করেছে। দীর্ঘ শ্রম ও প্রতীক্ষা শেষে শস্যশ্যামলা মাঠ, মুকুলিত আম্রশাখায় জ্বলেছে আশার আলোকবর্তিকা, অন্যদিকে কখনো কখনো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা-খরা-বন্যা- অনাবৃষ্টি-শূন্যমাঠ-কৃষিজীবী আদিবাসী সম্প্রদায়কে ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার আবর্তে।

আদিবাসী নরনারীর জীবনে মননে প্রকৃতির বিবিধ উপাদানকে ঘিরে যে অফুরন্ত আবেগ

অনুভূতির উৎসারণ ঘটেছে, তারই অনুরূপ প্রতিফলন দেখা যায় প্রকৃতিলগ্ন মানবেতর প্রাণীকে ঘিরে। শিকারজীবী, মৎস্যজীবী আদিবাসী জীবনে, কৃষিজীবী ও পশুপালক আদিবাসী জীবনে মানবেতর প্রাণী, পশুপাখী প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সহরায় বা বাঁধনা পরবকে ঘিরে গীত গানগুলিতে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুপ্রীতি, দৈনন্দিন জীবনে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের টুকরো ছবি ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিকারের গান, মাছ ধরার গানগুলিও উল্লেখযোগ্য। বিবাহের গান ও বিবিধ পর্যায়ের গানগুলিতে রূপক-উপমার সূত্রে এসেছে মানবেতর প্রাণীর প্রসঙ্গ। মানবেতর প্রাণীরূপে বারবার এসেছে মহিষ, খরগোশ, কুকুর, কালো খাসী বা শূকর ও ঘোড়ার পাশাপাশি কাক, চিতরি, তুদ্, দাসিম, চিল, সেরালি পাখীর প্রসঙ্গ। আদিবাসী সমাজে আমোদ ও অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় হল গীতবাদ্য যোগে ঘোড়া ও ঘুড়ীর নাচ। ৬৬ সংখ্যক (সাঁওতাল) বাহাগানে ঘোড়াঘুড়ীর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে 'নায়কি'র গৃহে প্রাঙ্গণে সবাই মিলে নাচ দেখার প্রসঙ্গ রয়েছে। দুই বোনের দ্বারা জাল বুনে 'বালে মাঙ্গরি' মাছ ধরার সুখকর চিত্র ধরা পড়েছে ৭১ সংখ্যক গানে। মাহালি গানে (২৬ সং) বিল থেকে মাছ শিকার করে ডালি-ভরা মাছ মাথায় নিয়ে ফেরার সময় সোনালি চিল তাড়া করলে মৎস্য শিকারী তাকে তীর নিয়ে মারতে উদ্যত হয়েছে। ওরাওঁ বিবাহসঙ্গীতে (৪৯ সং) 'কাক'-এর প্রসঙ্গ আনা হয়েছে বিবাহিতা কন্যার উপমানরূপে। কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরগৃহে যাত্রাকালে বেদনার্ত পিতামাতা দূরদেশে বিদায় নেওয়া কাকের প্রসঙ্গ এনে অন্তর্বেদনা ও ক্রন্দন ব্যক্ত করেছে, অতিশয়োক্তির চমৎকার নিদর্শন গানটি। কাকের উল্লেখ রয়েছে সাঁওতালদের 'বাহা' গানেও, সেখানে বোকা নির্বোধ পাখী রূপে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে কারণ লালবর্ণ ফুলকে দেখে বোকা কাক মাংস ভেবে খেতে গিয়ে ঠকেছে। সংলাপের ভঙ্গিতে গীত ৫৮ সংখ্যক সাঁওতালগীতিতে স্বামীর শিকার করে আনা খরগোশ ও চিতরি পাখির মাংস দ্বারা সযত্নে প্রস্তুত ব্যঞ্জনযোগে দাম্পত্য ভোজনের চিত্রটি অত্যন্ত সুখকর। উক্ত গানটিতে আবার শিকারযাত্রা প্রসঙ্গে ছোট ও বড় কুকুর সঙ্গে নেবার চিরায়ত প্রথার উল্লেখ লক্ষণীয়। মানবেতর প্রাণী এইভাবে আদিবাসী জীবনে-মননে-সঙ্গীতে দিনানুদৈনিক প্রয়োজনে, অবসর যাপন ও আমোদের উপকরণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতি ও মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে আদিবাসী সমাজের গভীর সম্পর্ক সূত্রের কথা সর্বাগ্রে স্মরণ করা হল বটে, কিন্তু সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জটিল ও রহস্যময় সম্পর্ক পরিবার তথা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে ঘিরেই বিন্যস্ত, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নি, দেবর-ননদ-বৌদি, শ্যালিকা-দেবর, ভাশুর-ভাদ্রবধূ, বেহাই-বেহান সম্পর্কগুলি তাদের যথার্থ স্বরূপে ও ভঙ্গিতে গানের ভাষিক আবেদনে ধরা দিয়েছে। পূর্বোল্লিখিত ৫৮ সংখ্যক সাঁওতালগীতিতে সুখী দাম্পত্যের শীতল ছায়া সর্বত্র পরিব্যপ্ত। ৬৮ সংখ্যক কোরাগানে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় মৎস শিকারের চিত্র জীবনসংগ্রামে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাহচর্যের পরিপাট্য আমাদের মুগ্ধ করে। একটি ওরাওঁ গানে (৫৫ সং) পতি বিরহিনী বধূর মর্মযন্ত্রণা সংক্ষিপ্ত সূচাগ্র ভাষায় ব্যক্ত। বহুদিন স্বামীর কোনো সংবাদ নেই, বধূটি কখনো বস্ত্রাঞ্চলরূপী কাগজে শোলার কলম দিয়ে

আপনকথা জানিয়েছে, কখনো বিদীর্ণ হৃদয়ের ওপর কর্তিত আঙ্গুলের কলমে দুঃখযন্ত্রণার বার্তা পাঠিয়েছে। অবশ্য দরিদ্র স্বামী যখন স্ত্রীর ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতে অক্ষম তখন শুরু হয় দাম্পত্য কলহ (ওরাওঁ গান, ৫৩ সং), এমনকি কখনো কখনো তা চিরবিচ্ছেদের মর্মান্তিক পরিণতিতে সমাপ্ত হয় (কোরাগান, ৬৭ সং)। আবার কোনো কোনো পরিবারে স্বামী-শাশুড়ীর গঞ্জনায় প্রহারে বিধ্বস্থ বধূ সাংসারিক মায়া ত্যাগ করে যোগিনী বেশে গৃহত্যাগী (কোরাগান, ৬৬ সং) হতে চেয়েছে। বৃদ্ধ পতির যন্ত্রণা যুবতী বধূর কণ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে ১০৫ সং সাঁওতাল গানে। আদিবাসী সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপ গানের আধারে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। আবার বিবাহকে ঘিরে পিতা-মাতা ও কন্যার মধ্যে উদ্ভুত হয় আসন্ন বিচ্ছেদজনিত বেদনা, একদিকে প্রিয় কন্যাকে তিল তিল করে বড়ো করার পর চোখের নিমেষে পর হয়ে যাবার হিসাব মেলাতে পারে না বাবা-মা, অন্যদিকে কন্যাও ভেবে পায় না তাকে এত তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বাবা-মা কেন এমন সর্বনাশ করল তার। বাবা-মা তবে কি পণের লোভেই এ কাজ করল এমন সন্দেহও কন্যাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ২৯ সংখ্যক কোরাগানে বাবা-মা আক্ষেপ করেছে কাঁচা দুধ খাইয়ে যে মেয়েকে বহু কষ্টে লালন করা হল, সে আজ সবাইকে দুঃখ দিয়ে পরের ঘরের গৃহিনী হতে চলেছে। ওরাওঁ গানে (৪০ সং) কন্যার আক্ষেপ সামান্য একটু সিঁদুরের জন্য বাবা-মা এমন নিষ্ঠুর হয়ে তাকে পরের হাতে তুলে দিল। একটি মাহালি গানে (১৭ সং) বাবা-মা-দাদা পরিবারের সবাইকে কন্যা দায়ী করেছে পণের লোভে তাকে বেচে দেবার জন্য। আদিবাসী সমাজে বিবাহের সময় কন্যাপণ এখনো প্রচলিত। এই সত্যের প্রতি সরব হয়েছে কন্যা। যদিও এই প্রতিবাদের মধ্যে কন্যার পরিবার বিচ্ছেদের প্রচ্ছন্ন অন্তর্জ্বালাই মুখ্য। ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহনির্ভর নিবিড় সম্পর্কের বাস্তবচিত্র বিশেষভাবে ধরা পড়েছে কোরা ও মাহালি সম্প্রদায়ের 'কারাম' ব্রতকেন্দ্রিক গানগুলিতে। শ্বশুড়গৃহ থেকে বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে বোনকে স্বগৃহে আনবার কঠিন সাধনা করে ভাই, অন্যদিকে ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় কারাম ব্রতের কঠিন সাধনায় আত্মনিবেদন করে বোনেরা, অসংখ্য গানে রয়েছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। বাংলা প্রবাদে ননদের রায়বাঘিনী রূপের ছবি আদিবাসী গানে সেভাবে মেলে না। বরং একটি গানে (কোরাগান, ৪৭ সং) ননদকে মহুয়াফুল ভেজে খাওয়ানোর কথা ভেবেছে বৌদি। বোন ও দিদির কথোপকথনমূলক বেশ কিছু গান রয়েছে সাঁওতাল 'বাহা' পরবকে কেন্দ্র করে। একটি গানে (৬৩ সং) দিদিকে বোন আবদার করে বলেছে তার মাথায় দিদি যেন ডিব্বার তেল মাখিয়ে কুন্দোর চিরুণি দিয়ে কেশ সজ্জিত করে দেয়। দিদি বোনের কথা রাখার পর বোনকে দুটি বিশেষ শাড়ি 'লুমং লগুড়ি' ও 'সিন্দুর শাড়ি' বার করতে বলেছে। এই বিশেষ বস্ত্র পরিধান করে তারা যাবে জাহের থানে। দুই ভগিনীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি সম্পর্কের আরেকটি নমুনা পাই ৭১ সংখ্যক গানে যেখানে দুজনে মিলে একত্রে মৎস্য শিকার করেছে। মানবিক সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আদিবাসী নরনারীর প্রেম-প্রীতি-বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলা অসম্ভব। মাহালি এবং কোরা প্রেমগীতিগুলিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। পার্থিব প্রেম আধ্যাত্ম রসের মধ্যে তার অপার্থিব আনন্দময় সত্তাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে, ঠিক দুপুরবেলা চিকন কালার বংশীধ্বনিতে সমস্ত কাজকর্ম আউলিয়ে

যাচ্ছে, কারণ এ বাঁশীর সুর সাধারণ নয়, এতে শুধু 'রাধা রাধা' ধ্বনি বাজে। উক্ত গানটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ভাবসাযুজ্য খুব স্পষ্ট। আবার ৫৯ সংখ্যক কোরা গানে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্খায় আঁধার রাতে প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্গম পথে অভিসার যাত্রা করেছে প্রেমিকা, অথচ তার মনে নেই ভয়। আশঙ্কাহীন এই প্রেমিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত আনন্দানুভূতিতে পরিপূর্ণ। দয়িতের সঙ্গে মিলনের পরমক্ষণ যে আসন্ন। গানটির শিল্পরস অনবদ্য। পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এই গানটিকে মহিমান্বিত করেছে নিঃসন্দেহে। ৭৭, ৭৮ ও ৭৯ সংখ্যক গানে (কোরা) অবশ্য স্নানসিক্তা রাধার পথ অবরোধ করে কৃষ্ণের দাঁড়িয়ে থাকা, রাধার অনুসন্ধানে কৃষ্ণের সাতজোড়া জুতোক্ষয়, রাধার আঁচল টেনে গজমোতির মালা ছিঁড়ে ফেলার অভব্য আচরণ লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই নিদর্শন, যা ভাবগত দিক থেকে পদাবলীর চেয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অনেক বেশী নিকটবর্তী। আদিবাসী সমাজে প্রেম-প্রীতি-বন্ধুত্বের গভীর আবেগতাড়িত বাস্তবরূপের সাক্ষাৎ মেলে ওরাওঁ সঙ্গীতে। ওরাওঁ সমাজে বরের ভাই-কনের বোন কিম্বা বরের বোন-কনের ভাই পরস্পর 'গুইয়া' সম্পর্কাবদ্ধ। তাদের হাস্য পরিহাসোচ্ছল বন্ধুত্ব প্রীতি ও প্রেমসম্পর্ককে ঘিরে প্রচলিত বহু গান ওরাওঁ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এসব গানে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সাহসিকতার আবেগ স্বতোৎসারিত। (২৭ সং) প্রেমপিরীতির খবর তো গোপন থাকবার নয়, গোষ্ঠী-সমাজ-প্রতিবেশী এমনকি বাবা-মার তিরস্কারকে অগ্রাহ্য করে তারা নিজেদের স্বাধীন ভালবাসাকে জয়যুক্ত করার সংকল্পে অটুট থেকেছে। দুজন মিলে একত্র দাসাই পরব দেখতে যাওয়া, প্রেমের আবেগে গুইয়ার হারিয়ে যাওয়া নূপুরের জন্য উদ্বেগ ও অনুসন্ধান (৫৭ সং), পারস্পরিক ভালোবাসার গভীর সম্পর্ককে অটুট রাখার সঙ্কল্প গানগুলিকে প্রেমের বহুমাত্রিক আস্বাদনে ভরিয়ে তুলেছে। সহজ-সরল ভাব ও ভাষানুসারী এই গানগুলির শিল্পমূল্য মোটেই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক নয়। তীব্র আবেগ গভীর রসবোধ-সহজ সংক্ষিপ্ত ভাষাশৈলী-মৌলিক ভাবৈশ্বর্যে আদিবাসী সঙ্গীতের বিপুল বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডার বিশ্বের তাবৎ সঙ্গীতরসধারার মাঝে আপন স্বাতন্ত্র্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় পর্ব

নিজস্ব সংগৃহীত আদিবাসী সঙ্গীত

সাঁওতাল গীতি

(১)

তোকোই মেদোই য়াম লিদা
কারামে কা দারি হো
তোকোই মেদোই সার লেদাং
কারামেকা ডাঢ়
তোকোই মেদোই সগুন লেদা
জুড়ি কারাম ডাঢ়
কানাই মারহায় য়াম লেদা
কারামেকা দারি হো
পারাণিক বাবা সারলেদা
কারামেকা ডাঢ়
মাঝি বাবায় সগুন লেদায়
জুড়ি কারাম ডাঢ়
চিকায় লাগি পারাণিক বাবায়
সারলেদায় কারামেকা ডাঢ়
চিকায় লাগি মাঝি বাবায়
সগুণ লেদা কারামেকা ডাঢ়
সিওয়ার লাগি পারাণিক বাবায়
সারলেদা কারামেকা ডাঢ়
ধরম লাগি মাঝি বাবা
সগুন লেদা জুড়ি কারাম ডাঢ়।

টীকা : কারাম গান। করম গাছের ডাল কারা পেয়েছিল, কারা দেখেছিল জোড়া ডাল। মাঝি, জগমাঝি, পারাণিক, জগপারাণিক, গোডেত পাঁচজন মিলে দেখল, পছন্দ করল জোড়া ডাল, একটা রাখাল করম ডাল দেখেছিল, তারপর গ্রামের পাঁচজনা মিলে নিয়ে আসল। মাঝি নিয়ে এল সবার সম্মতিতে। কী কারণে এই ডাল পছন্দ করা হল। যেহেতু ডালটা ভাল এবং তাকে পূজা দেওয়া হবে, সেকারণে পছন্দ করা হল।

(২)

বাছাই দেহো জগমাঝি
কারামেকা ডাঢ়
বাছাই দেহো জগমাঝি
জুড়ি কারাম ডাঢ়
ছাঁদাই দেহো জগমাঝি
জুড়ি কারাম ডাঢ়
ধরাই দেহো জগমাঝি
জুড়ি কারাম ডর কে যো
ধরাই দেহো জগমাঝি
চোবাছা নাবালক ছলিয়ে য়ো
জুড়ি কারাম ডর কে যো
ধরাই দেহো
কাটায় দেহো জগমাঝি
জুড়ি কারাম ডঢ় কে যো
একাই মিলে কাটায় দেহো।

টীকা : কারাম গান। জগমাঝি তুমি করমের ডাল বেছে দাও, জোড়া করম ডাল বেছে দাও। ডাল দুটোকে জগমাঝি বেঁধে দাও। সেই জোড়া ডাল কার্মু ধার্মু দুই ছেলের হাতে ধরিয়ে দাও। দুটি ছোট ছেলেকে দাও ডাল দুটো। একটাই কোপে ডাল কাটো।

(৩)

তাহারিতা নানা এানা তাহারিতা নানা হো...
চলো সেহো জগমাঝি
চলো সেহো জগপারাণি
হো যাব লে যাব
মাঝি কুলহি আখাড়াতে
বিহাহুলি যাই
চলো সেহো মাঝিবাবা
চলো সেহো প্রাণিকবাবা
হো যাব লে যাব
জুড়ি কারাম ডাঢ়
মাঝিকুলি আখাড়াতে
বিহাহুলি যাই
চলো সেহো দশজনা
চলো সেহো পাঁচজনা

হো যাব লে যাব
জুড়ি কারাম ডাঢ়
মাঝিকুলি আখাড়াতে
বিহাহুলি যাই।

টীকা : কারাম গান। করম ডাল আনতে যাবার সময় জগমাঝি, জগপারাণিক, পারাণিক সবাই আছে, সবাইকে সামনের রাস্তায় জোড়া কারম ডাল কাটতে যাবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিনতি ঠাকুরও থাকেন সেখানে। দশজনা, পাঁচজনা সেখানে চল।

(৪)

খোরায় দেহো জগমাঝি
মাঝিকুলি আখাড়াতে
গাড়ায় দেহো জগমাঝি
জুড়ি কারাম ডাঢ় কে হো
গাড়ায় দেহো জগমাঝি
মাঝিকুলি আখাড়াতে
দে গাড়ায় দেহ।

টীকা : কারাম গান। জগমাঝি, মাটি খুঁড়ে দাও, মাঝরাস্তায় আখরাতে। সেখানে জোড়া করম ডাল পুঁতে দাও জগমাঝি। মাঝরাস্তার আখড়ায় ডাল পুঁতে দাও।

(৫)

ইরে রামকরিয়ে চোলায়
আখাড়া চোলায় রে
ইরে রামকা কোনাহি চোলায়
ঝালামাল ইরে হোরে
কো নাহি চোলায়
ইরে রামকারিয়ে চোলায়।

টীকা : কারাম গান। কোদাল দিয়ে করম ডাল স্থাপনের পূর্বে স্থানটিকে পরিস্কার করতে বলা হচ্ছে রামকাকে (জগমাঝি), সেখানে রামকি (জগমাঝির স্ত্রী) পরে লেপন করবে।

(৬)

ইরে রামকিরাইয়ো নিপোই
আখাড়া নিপোই
আখাড়া তো নিপোই ঝালামাল হো
ইরে গাইকিরা গোবর
সামুধা কাপনি
এ হোরে রামকি রাইয়ো নিপোই ঝালামাল
আখাড়া নিপোই রে

আখাড়া নিপোই ঝালামাল এ হো রে
কোনাহি নিপোই
আখাড়া নিপোই ঝালামাল
রামকি দেবিও নিপোই
রামকি রাইও নিপোই।

টীকা : কারাম গান। রামকি করমপূজার আখড়া লেপন করেছে। জগমাঝির স্ত্রী 'রামকি' গোবিষ্ঠাসহ আখড়া লেপন করে পরিস্কার করছে, শুদ্ধ করেছে।

(৭)

ইরে রামকা রাইও পূজোয় মাহাথান
আখাড়া পূজোই মাহাথান
আখাড়া পূজোই মাহাথান রে হোরে
কোনহি পূজোয় আখাড়া পূজোয়
ইরে কিনা কিনা পূজোয়
আখড়া পূজোই গে
আখাড়া পূজোয় মাহাথান
কোনহি পূজোয় আখাড়া পূজোয়
ইরে বেলপাত তুলসীপাত্ কাঁচা দুধ
আর্ওয়া চাল
পূজোয় মাহাথান।

টীকা : কারাম গান। রামকা ও রামকি তোমরা পূজার মহাথানে আখড়ায় পূজা কর। কী কী দিয়ে পূজা করবে। বেলপাতা, তুলসীপাতা, কাঁচাদুধ, আতপচাল দিয়ে পূজা করবে।

(৮)

ফাল্না মান্ঝি ফাল্না রেইয়ে
কারমেকা ডাওলে কারমেকা ডাঢ়
হামি আইও মনে রে বড় ভয়োন্
এতদিন এত রাত না জানি জানাইলম্
হামি আইয়ু মনে রে বড়ো ভয়োন্।
দেশে গো আইও দেশে গো বাবা
গডাহি লিপুরা ডাণ্ডাহি উরমল আ
দেশে গো আইও দেশে গো বাবা
হামি আইয়ু যাইব আইয়ু।

টীকা : কারাম গান। অমুক মাঝির এলাকায় একটা কারামপূজা হবে, সেটা এখন জানলাম। আমি এখন সেখানে যাব, তাই মনে ভয় করছে। গোটা গায়ে, পায়ে নুপুর পরে সবাই কারাম পূজায় নাচতে যাচ্ছে। আমি সেই দেশে যাব, মনে ভয় করছে।

(৯)

কাকারিয়া বুদেতে কাকারিয়া বিচ্‌রেতে
চিয়াইলোমা কাটাইলোমা নামাইলোমা
আনাইলোমা মাঝিকুলি গাড়াইলোমা
জুড়ি কারাম ডাঢ় ও রে না হারে
মাঝিরিয়া বুদেতে পরাণিকিও বিচ্‌রেতে
চিয়াইলোমা কাটাইলোমা নামাইলোমা
আনাইলোমা মাঝিকুলি গাড়াইলোমা
জুড়ি কারাম ডাঢ় ও রে না হারে
দসেরিয়া বুদেতে পাঁচেরিয়া বিচেরেতে
চিয়াইলোমা কাটাইলোমা নামাইলোমা
আনাইলোমা মাঝিকুলি গাড়াইলোমা
জুড়ি কারাম ডাঢ় ও রে না হারে
য়ুর্‌নি বনে জগ্‌মাঝি
চিয়াইলোমা কাটাইলোমা নামাইলোমা
আনাইলোমা গাড়াইলোমা
জুড়ি কারম ডাঢ় ও রে না-হারে।

টীকা : কারাম গান। কার কার বুদ্ধিতে, বিচারে জোড়া করমডাল বেছে, কেটে, নামিয়ে এনে মাঝরাস্তার আখড়ায় স্থাপন করা হল। মাঝির বুদ্ধিতে, পারাণিকের বিচারে করা হল। দশের বুদ্ধিতে, পাঁচজনের বিচারে এসব করা হল। বনের মধ্যে গিয়ে জগমাঝি সকলের সঙ্গে করমডাল বেছে, কেটে নামিয়ে আখড়ায় পুঁতল।

(১০)

কারাম কারাম বুটো রে
জুড়ি কারাম বুটো রে
কার্‌মু ধার্‌মু কিন্‌দোদন কানা
মাসে মারাং দাদা নুডুং লেন মে
কারাম কারাম বুটো রে
জুড়ি কারাম বুটো রে
কারমু ধারমু কিন্‌দোদন কানা
কারাম কুপাল কিন ভাঁওসাও ইদা
মাসে মারাং দাদা নুডং লেন মে
কারাম কারাম বুটো রে...
জুড়ি কারাম বুটো রে
কারমি ধার্‌মি কিন্‌ নেনেইকানা

মাসে মারাং দিদি নুডং লেন মে
কারাম কুপাল কিন ভাঁওসাও ইদা জোং কান।

টীকা : কারাম গান। কারাম গাছের নীচে, জোড়া কারামের নীচে কার্মু ধার্মু দুই ভাই লাফাচ্ছে, নাচানাচি করচে। দাদা তুমি ঘর থেকে বেড়িয়ে দেখো। করমের আগমনের এই আনন্দের সাথে আমাদের কপাল বা ভাগ্য বংধা। কারাম গাছের নীচে, জোড়া কারামের নীচে কর্মি ধর্মি দুই বোন নাচ করছে। দিদি, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে যাও। কারামের এই আনন্দের সাথেই আমাদের আনন্দের ভাগ্য জড়িয়ে আছে।

(১১)

বাজাতে লাগাল্ হাঁসকা দারিয়া
নাতায় লাগালুমা নাটু ও
মাকেরে খেরে কেরে খিলাব রে
গাইনাহারে নাটুয়ারে বৈয়ো হো
পৈঙ্গো না জানি উড়ি গেলে হো
বাজাতে লাগাল্ হাঁসকা দারিয়া।

টীকা : কারাম গান। বিবাহের সময়ও গীত হয়। একদল আরেক দলকে মাদল বাজাতে বলছে আনন্দে। নাটুয়া নাচ করা হবে। লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নৃত্য হবে। নাচনেওয়ালা ভাইরে, নাচের আওয়াজ, ঝুমুরের শব্দে ভরে উঠল চতুর্দিক।

(১২)

বলি সিরিব্রিধো বোনাকিরি
মাচিবোন কারামিকা গাচাহো
সেহো কারমা চিআলাং
সেহো মাচিবোন
বলি সিরিব্রিধো বোনাকিরি
মাচিবোন্ কারামিকা গাচাহো
সেহো কার্মা কাটালাং
সেহো মাচিবোন
সেহো কারমা আনালং
সেহো মাচিকুলি
সেহো কার্মা বিদালাং
সেহো মাচিবোন।
সেহো কারমা খাদালাং
সেহো মাচিকুলি।

টীকা : কারাম গান। একটি বনে বা জঙ্গলে আছে করম গাছ। মাঝবনে করমের গাছ। সেই করমের ডাল সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করে কাটা হল, সেই করম ডাল গ্রামের মাঝ রাস্তায় (আখড়াতে) এনে নির্দিষ্ট স্থানে তাকে পূজার জন্য স্থাপন করা হল।

(১৩)

কিন্‌হি সিরিজালা ভূমে পির্‌থিমি হো
কিন্‌হি সিরিজালা মুলুকে যো হুই
ঠাকুরাহি সিরিজালা ভুমে পিরথিমি হো
ঠাকুরাহি সিরিজালা মুলুকে যো হুই।

টীকা : কারাম গান। কে সৃষ্টি করল পৃথিবী, কে সৃষ্টি করল দেশ। ঠাকুর সারা পৃথিবী ও দেশ সৃষ্টি করল।

(১৪)

তাহারি এনানা এনা তাহরি এনানা হো...
দেশে গো আইও দেশে গো বাবা
গোডাহি লিপুরা
দেশে গো আইও দেশে গো বাবা
ডাণ্ডাহি উর্মালা
হামি আইও যায়বো আয়ত্ত
কারমে বালাদে এ কায়হো
কারমে বালাদে সেওয়া
তাহারি এনানা এনা
তাহিরি এনানা হো...

টীকা : কারাম গান। আমরা আজ দেশে এসেছি কারামকে সেবা করতে, ভক্তি করতে। আমাদের পায়ে গোড়ালিতে নুপুর, কোমরে কোমরবন্ধ। আমরা কারামের সেবা ভক্তি করতে এসেছি।

(১৫)

আখাড়াতো পূজোয় মাহাথান হো
আখাড়াহি পূজোয় রাডি বা সালখান
ডাহিনেতে সিরিলুঙ্কা গাঢ় হো
য়ো সারি গাঁওয়া সারি
দিওয়ারি ধরম হো
লেটো লেটো লেটো লেটো।

টীকা : কারাম গান। আখড়ায় মহাথান তৈরী করা হয়েছে। সেটি খুব পবিত্র স্থান। সবাই মিলে, করমপূজা করা হল, গ্রামের সবাই মিলে পূজা করল। এটা গ্রামের ধর্ম।

(১৬)

কোন সাপা খাইলে রিবাং
তোংকা তোংকা তোহং গিলারেরে বিষ
সি ব্রান্নাক চিতি খাইলেরে মায়েং

ব্রান্নাক বাচা খাইলেরে তোকে
হাল্মান্ কুআঁর লিলিবিচি গরুরা দোহায়
রামচিতারে দোহায় চিতা গরুরা দোহায়
নায়াং সাপা খাইলে রিবাং
তোংকা তোংকা তোহং গিলারেরে বিষ
সি ব্রান্নাকে চিতি খাইলে রে মায়েং
ব্রান্নাকে বাচা খাইলেরে তোকে
হালমান কুআঁর লিলিবিচি গরুরা দোহায়
রামচিতারে দোহায় চিতা গরুরা দোহায়
গাণ্ডিত সাপা খাইলে রিবাং
তোংকা তোংকা তোহং গিলারেরে বিষ...
কুঠা সাপা খায়লে রিবাং
তোংকা তোংকা তোহং গিলারেরে বিষ...
গোমা সাপা খাইলাং রিরাং
তোংকা তোংকা তোহং গিলারেরে বিষ...

টীকা : সর্পবিষ নামানোর সময় গানটি গাওয়া হয়। কোন সর্পের দংশনে দেহ বিস্ময় হয়েছে ওঝা সেটি জানে না, অনুমানে বুঝতে চাইছে। বিশেষ সুরের মাধ্যমে এই গানটিতে বিভিন্ন প্রকার সর্পের নাম উচ্চারণ করে ঝাড়তে থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। এখানে নায়াং, গাণ্ডিত, গোমা সাপের নাম পাওয়া গেছে।

(১৭)

পাতাল সোচল বিষ ধরতি সো মার বিষ চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা
ধরতি সো চল বিষা আঙ্গুরু সো মাল বিষা চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা
নখে সো চল বিষা গৃহসোমাল বিষা চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা চ...
গৃহে সো চল বিষা সুকৃতি সো মাল বিষা চ
রাবো বিষা কালো মেগের বিষা চ

টীকা : কেরাপূজা/খেরাপূজা/বিষচাকোলের গান। পাতাল থেকে পৃথিবীতে বা ধরতিতে বিষ ওঠানো হয়। কালো মেঘের মত বিষ। তারপর সেখানে হাত রাখলে হাতে বিষ উঠবে, তখন হাত চলতে থাকে। তিন-চার জনের মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক খেলা চলে। যার হাত বেশি চলে, সে জয়ী হয়।

(১৮)

আইসো না বাইসো মায়গো
কমোরে বাইসো মা
কমোরে দুইয়ু দুতি পাবি
পাতালে রো বেঙ কান্দে
উপারে তো দিয়া ঢাকি
বিষা কই রে যাদু বিষা বাই রে
(সমবেত ধ্বনি) টোল টোল...টোল টোল
শ্রীরামপুর ছাতাতে গুণ কাটি দে
শ্রীরামপুর ছাতাতে বাণ কাটি দে
এ টে তো ধারতি মায়
উপরে তো ঠাকুর ঠাক্‌রাইন
সাজাই লাগাল নাচায় লাগাল
দেখাবো গো মায় মনসার ঘরে
এমনে রোদন পরে
এমনে রোলাল পরে
ই দোষের কৈলো কামড় বেলালে বেলোম
সরস্বতী সরস্বতী লীল্লোবরণে
মহাদেবের কাণ্ডকারণে।

টীকা : কেরাপূজার গান। এতে সাঁওতাল দেবদেবী ঠাকুর ঠাক্‌রাইনের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে মনসা, মহাদেব এবং সরস্বতীর নাম।

(১৯)

উরা বিষ নামাইলম চুলে পাঢ়ি
গরুরা রে নামাইলা বিষা
যাইবে ভয়িন বাঢ়ি দূর
চুলে সো নামাল্ বিষা
নামাইলম্ কোপালম পাঢ়ি (২)
গরুরা রে নামাই রে বিষা
যাইবে ভয়িন বঢ়ি দূর
কোপাল সো নামাল্ বিষা
নামাইলম গোলায় পঢ়ি (২)
গরুরা রে নামাই রে বিষা
যাইবে ভয়িন বঢ়ি দূর
গোলা সো নামাল বিষা
নামাইলম কোমর পঢ়ি (২)

গরুরা রে নামাই রে বিষা
যাইবে ভয়িন বঢ়ি দূর
কোমর সো নামাল বিষা
নামালম গৃহয় পড়ি (২)
গরুরা রে নামাই রে বিষা
যাইবে ভয়িন পঢ়ি দূর
ধরতি সে নামাল বিষা
নামালম পাতাল বঢ়ি (২).
গরুরা রে নামাইবে বিষা
যাইবে ভয়িন বঢ়ি দূর

নাম নাম রে বিষ ধরতি সো নামাল
বিষ পাতাল বঢ়ি ভেল সে এ বিষ
কে বান্ধে গুরু বন্ধন শিরি
কিরিয়া কামরুম দোহায়।

টীকা : নামান গান। সর্প বিষ নামানোর সময় গানটি গাওয়া হয়। চুল থেকে কপাল, গলা, কোমর, পা দিয়ে পাতালে নামাতে হয়। ধরতি থেকে তাকে পাতালে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

(২০)

উজারেমা ডিহো গ্রুহো
বুনায়লো মা সার্‌সা
হারি নিজো চারায় চারায়
বিরিনিজো ঝোমুকলিযায়।

টীকা : দাসাই গান। ভূমির মালিক জমিতে সরষে বুনল, তাতে হরিণ চড়ে বেড়াচ্ছে, সরষে খাচ্ছে এবং আনন্দে নাচছে।

(২১)

গ্রুদোয় গ্রুদোয় বুলেন্দো
গ্রুদোয় গ্রুদোয় তুহে লেন্দো
দেনগো নেয়োগো লোটাদাদো
দেনগো নেয়োগো ঝারিদাদো
গ্রুদোয় গ্রুদোয় এুসিজোলেয়া।

টীকা : দাসাই গান। গুরুর নেশা হয়েছে। লোটায় রয়েছে তুলসীর পবিত্র জল। শিষ্য বলছে, দাও, আমায় লোটার জল দাও। সেই পবিত্র তুলসী-জল ছিটিয়ে দিলে গুরুর নেশা কেটে যাবে।

(২২)

ই গাওতে দেওয়ারে ধরোম
হরি হরি তোলোকে সিঁদুর
দে সে গো আইয়ো য়ো
হরি হরি গুরু আকাড়াহ্সি আওয়ায়

টীকা : দাসাই গান। গ্রামে ছেলের দল ঢুকছে। ছেলেরা নাচ করলে, মন্ত্র বললে, গৃহস্থ তাদেরকে ভুট্টা, ধান দেয়। অন্যদিকে তারা দেয় (গৃহস্থকে) তেল-সিঁদুর।

(২৩)

কাসিমার টাণ্ডি রে কাসিমার টাণ্ডি রো
গ্রুহো কাসিগোরো বাহা দ
গ্রুহো গুরামা গ্রুকুল রে
গ্রুহো গ্রুজাগোরো বাহা দ
কাসিমা টাণ্ডি রে কাসিমা টাণ্ডি রে
গ্রুহো কাসিমায় বাহা দ
গ্রুহো গুরামা মুতুল রে
গ্রুহো রাজাগোরো বাহা দ
ও আলায় গ্রুহো বাহা দ
বাহায় আলাং গ্রুহোগোরে
রাজা গোরো বাহা দ
ও আলাং গ্রুহো
কাসিগোরো বাহা দ
নাপায় ঞলো গ্রুহো
কাসিগোরো বাহা দ
দালিংঞলো গ্রুহো
রাজাগোরো বাহা দ।

টীকা : দাসাই গান। 'গুরুজাগাও' গান বলা হয়। দুটি সুন্দর ফুল কাসিগোরো এবং রাজাগোরো ফুলের কথা বলেছে শিষ্য। গোয়ালের এক কোণায় গাছ আছে, তাতে কাসিগারো ও রাজাগারো ফুল ফুটেছে। চেয়ে নেব রাজাগোরো ফুল। সুন্দর দেখানোর জন্য কাসিগোরো ফুল আনা হবে। সাজানোর জন্য রাজাগোরো ফুল আনা হবে।

(২৪)

সোলোক মেনা গ্রুহো দেলাং জোহারা
বাদোত্ মেনা গ্রুহো বালাং জোহারা
যো হরি গ্রুহো যো হরি
যো হরি গ্রুহো দেলাং জোহারা।

টীকা : দাসাই গান। দাসাই-এর দুই দলের মধ্যে তর্কের গান। একদল আরেকদলকে তখনই নমস্কার জানাবে যদি তাদের সঙ্গে বনিবনা হয়। নতুবা তারা নমস্কার জানাবে না।

(২৫)

তুলসী পিঢ়ায় চট বেদয়
কামরু গুরু দুরুপ আকান
তোয়া তিলং গুড়ি যাহো পিন্ড দ
দাহি তিলাং গেমে যাহো
তুলসী পিন্ড দ।

টীকা : দাসাই গান। শিষ্যরা দুধ দিয়ে তুলসীতলে প্রস্তুত পিঁড়িকে লেপন করেছে। সেখানে কামরুগুরু পূজা করবে।

(২৬)

তোকোয় গুরু দ গুরু দ
আখড়া লেদা রে
গুরু দ আখাড়া লেদা
তোকোয় চিলা দ চিলা দয়
পিন্ড্ লিদা রে চিলা দয়
কামরু গুরু দ গুরু দ
আখাড়া লেদা রে
গুরু দ আখাড়া লেদা রে
(হরিহরি) কামরু চিলা দ চিলা দ
পিন্ড্ লিদা রে চিলা দয় (পিণ্ড লিদা রে)
চিতি লাগিন দ গুরু লেদয়
আখাড়া লেদা রে গুরু দয়
আখড়া লিদারে
চিতি লাগিন দ চিলা দয়
পিন্ড্ লিদা রে চিলা দয়
পিণ্ড লিদা রে
সুনুমা সিন্দুর লাগিন
গুরু দ আখাড়া লিদা রে
আইনম কাজল লাগিন চিলা দয়
পিণ্ড লিদা রে চিলা দয়
পিণ্ড লিদা রে।

টীকা : দাসাই গান। কামরু গুরু ও তার শিষ্য থানে পুজা দেবে। গুরুর থানকে বলে 'আখড়া', শিষ্যের থানকে বলে 'পিণ্ড'। থানে হলুদ, সিঁদুর দেওয়া হচ্ছে পূজার সময় গুরু আখড়ায় পূজা করছে। শিষ্য পূজার থানে পিণ্ড কাজলের ফোঁটা দিয়ে পূজা করছে।

(২৭)

কাঁহাসো হিরায়া বাবু মুড়ুরিকা গায়
কাঁহাসো হিরায়া বাবু হাতিকা বাঁশী
য়ো রে হায় হায় কোন শিং-এ মাখাবো তেল
নাজো হুই—
বীরযু বনে হেরায়া বাবা মুড়ুরিকা গায়
য়ো হো ডাহাররে হেরায়া বাবা হাতেকা বাঁশী
আজো কোন শিংয়ে মাখাবো তেল
মুড়ুরিকা গায়
গায় সিনি আওয়ায় বাবু
বেলামা ডুবি গেল্।
মুহিষিনি আওয়ায় বাবা আধারাতে
মুহিষিনি শিং বাবু ইআকুজা বাঁকুজা
মুহিষিনি শিং বাবু কুজুরিকা তেল
মাখায়ে দাও।

টীকা : সহরায় বা বাঁধনা গান। কোথায় হারিয়ে গেল ছোট শিং-এর গাই। কোথায় হারাল হাতের বাঁশী। এখন কোন শিং-এ তেল মাখাব। বীরযুবনে মুড়ুরিকা গাই হারাল। রাস্তায় হারাল হাতের বাঁশী। কোন শিং-এ তেল মাখাব, শিং-ই নেই। বেলা চলে গেলে মোষ এল অন্ধকারে। মোষের আঁকাবাঁকা শিং-এ কুজুরের তেল মাখিয়ে দাও।

(২৮)

তিহিন দলেনুম কানা
দলবদোল পুখুরিরে
গাপা দলেন বোঙ্গানকান
দাড়াহারা চাতোম নুরা।

টীকা : বাঁধনা গান। আজ আমরা পুকুরে স্নান করে শুদ্ধ হচ্ছি। আগামীকাল আমরা পূজা করব। ঘরের মধ্যে পূজা করব।

(২৯)

হাতে নিলাম পাকোর পায়েরে
গুছায় নিলাম ইয়ারোয়া চাল
বাবু রে, ইয়ামকি রেইয়ে গাইয়ে চুমায়
বাবু রে, একা চুমায় দুইও চুমায়
বাবু রে, গোড়িকা দিবোই বাবু রিলোইমালা
বাবু রে, মুড়িকা দিবোই বাবু পাগৌরি।

টীকা : বাঁধনা গান। হাতে নিলাম প্রদীপ, গোছায় আতপ চাল। মেয়েরা পাই চুমাচ্ছে, একজন-দুজন চুমাচ্ছে, গরুর গলায় ধানের মালা বা ছড়া এবং মাথায় সিঁদুর দেব।

(৩০)

দাদা যায়ে হেন্দেল সিং মেন্দেল সিং
দাদা যায়ে ছুটোল চাম্পা গাড়
বহিন গে কান্দায়ো না খিদায়ো না
বহিন গে কানকা সোনা বিছাই বহিন গে
হাতকা শঙ্খা বিছাই বহিন গে
তাহো না লিবে চাম্পা গাড়।
মীনখুকিলাং কুচোইলেন ভায় রে ভায়
মিদুয়া লাং জাম্বের লেন ভায় রে ভায়
ধরতির দ বালাং সাহোপ্‌লেন ভায়
লে ভায়রে গাণ্ডো
লে ভায়রে মাচি
নিয়ে গিরে ভায়রে মানমিনতি।

টীকা : বাঁধনা গান। হেন্দেল সিং সেন্দেল সিং দুই দাদা বোনকে শ্বশুরগৃহ থেকে আনতে গেছে বাঁধনা পরবে। বোন তখন চম্পাগড়ের ভাগ চেয়েছে। ভাইয়েরা বলছে, বোন তুমি কেঁদো না, খেদিয়ো না, তোমার বিয়েতে কানের দুল, সোনা-দানা ও হাতের শাঁখা দেওয়া হয়েছে। তাও তুমি চম্পাগড় চাইছ। একই মায়ের গর্ভে আমরা ছিলাম। একই মায়ের দুধ খেয়েছি। আমরা মিলেমিশে থাকব। কিন্তু বড় হওয়ার পর আমাদের বিভেদ হতে শুরু করল। বোন বলছে, নাও ভাই গাণ্ডো (পিঁড়ি), তুমি মাচা নাও, ভাই, তোমাদের বসার জন্য মিনতি করছি।

(৩১)

ধানি ধানি ধানি গে য়ান্দো ধানি
চিকানলিকান হর
ডাংরা ঠেন হাটা ধানি
ফান্দা নাচুকেন (উচুই্‌য়েন)
দাদা দাদা দাদা যা য়াম্দো দাদা
চিকান লিকান হর।
কাডাঠেন ফিরি দাদান
থাপা নাচুকেন্।

টীকা : বাঁধনা গান। ধানি (জনৈক কন্যা), তুমি কেমন মানুষ। বলদটা তার বরণের বা চুমানোর কুলাতে পা দিয়ে লাথি মেরেছে। উত্তরে ধানি বলছে, দাদা, তুমি কেমন পুরুষ। যারা নাচ করছিল তাদের হাতের 'ফিরি'তে (নাচের বিশেষ যন্ত্র) মোষ শিং দিয়ে গুঁতো মেরেছে।

(৩২)

তোকোই কারালাং নোডং ইতালাং
তোকোই কারালাং ধুরিয়ে নুটাং[১]

তোকোই কারালাং সাকামে হালাং
ভাইরে ভাই
উনি কারালাং নুডুং ইতালাং
চাওয়া কারাং ধুরিয়ে নুটাং
ভাইরে ভাই, চাওয়া কারালাং
সাকামে হালাং ভাইরে ভাই
উনি কারালাং নুডুং ইতালাং।

টীকা : বাঁধনা গান। কোন মোষ ধূলা ওড়াতে পারবে, পাতা কুড়াতে পারবে। যে মোষ ধূলা ওড়াতে ও পাতা উঠাতে পারবে, তাকেই বার করব। ভাইরে ভাই, ঐরকম চওড়া মোষ, স্বাস্থ্যবান মোষকে বার করব, যে ধূলা ওড়াতে পারবে।

(৩৩)

তারি এানানা নানা এানানা
ই হি হি হি কি হা হা হা
তারি এানানা নানা এনানা
বলে লুকু মানোয়া সাগাল সাগাল
পিলচু হারাম হপোন্ হো
নুকু সিম্ সাগাল সাগাল
কালোট নিগা হপোন হো।
খেদি আকুম্মে বুড়্হি তালসিআকুম্মে
বুড়্হিগিজা বড়ো হারামজাদা
হি হি হি হা হা হা

টীকা : বাঁধনা গান। আদি মানব-মানবী পিলচুহারাম ও পিলচু বুড়ীর অনেক সন্তান-সন্ততি ছিল, তেমনি এই 'কালোট' মুরগীরও অনেক বাচ্চা হয়েছে। বুড়ো বলছে, মুরগীটাকে একটু খুদ খেতে দাও। কিন্তু বুড়ী দিচ্ছে না কিছুতেই। বুড়ো রেগে গিয়ে বুড়ীকে 'হারামজাদা' বলেছে।

(৩৪)

ডুডু ডুডু ডুডু যা দাঁড়ায় কোকান দৈ
ঘাট দাইকু নেসেনাকা
ধুরি দাইকু ডিগ্‌লাম আগুই এ
আদম দৈনা লাউরিয়া
আদম দৈনা পৈকা
ঘাটা দাইকু নেসেনাকান।

টীকা : বাঁধনা গান। মোষেরা খেলছে। ধূলো উড়ছে। বাঁধনা পরবে মোষ খেলার সময় বহু গ্রাম থেকে লোক আসছে। খেলা দেখতি কিম্বা দেখাতে। তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক লাউরিয়া, অর্দ্ধেক পৈকাহা। এই দুটি দলে ঘিরে ঘাট বন্ধ করে রেখেছে।

(৩৫)

গাডা দাদা লায় মেসে
খুন্টি দাদা বিদমে
চাওড়াবাওড়া কাডা দাদালাং
নুডং ইতালাং

টীকা : সহরায় গান। 'খুন্টা' বাঁধার গান। জগমাঝিকে উদ্দেশ্য করে যে বাড়ির মোষ বেরোবে তারা গাইছে। চওড়া হৃষ্টপুষ্ট মোসটিকেই 'খুন্টি' বাঁধার জন্য বার করা হবে।

(৩৬)

খুঁটি গাড়োরে কামেয়া
খুঁটি গাড়োরে কামেয়া ডাণ্ডার জোখে
দুড়ি বান্দোরে কামেয়া দুড়ি বান্দোরে
দুড়ি বান্দোরে কামেয়া গোলার জোখে।

টীকা : সহরায় গান। গরুকে কেমন করে বাঁধা হবে মালিক কামেয়াকে (জগমাঝিকে) বলা হচ্ছে। খুঁন্টি গাড়তে, দড়ি দিয়ে বাঁধতে বলা হচ্ছে গলা দেখে।

(৩৭)

কাসিমাটাণ্ডি বাবু
গাইমা চাড়াইয়েতে
চাড়াইতে চাড়াইতে বেলামা
ডুবি গেল্ নাজো
য়ো রে হায় হায়
কোন শিং-এ মাখাবো তেল
নাজো হুই।

টীকা : সহরায় গান। দিনের বেলায় উম্‌ডাব্‌র, বিকালে গোড্ পূজা। গোড পূজায় গরুকে কোথায় নিয়ে যাবে তার গান, রাখাল গাইছে। গাই চড়াতে চড়াতে বেলা পার হয়ে গেল, সূর্য ডুবে গেল, এখন কোন শিংয়ে তেল মাখাবে রাখাল।

(৩৮)

নাপুইং কোদো বারিং কোদো
তোঢ়ে ড়োঢ়ে পুখুরিখু
নুমুখকানা বাবা
দেশরেদো দিশামরেদো
মেনাকু বাবা।
দ্লাবুন দ্লাবুন
মামাতেকু ঠেন।

দ্‌লাবুন দ্‌লাবুন
মামাতেকু ঠেন।

টীকা : বাঁধনা গান। বোন তার সন্তানকে বলছে, আমার বাবা ও ভাই ওরা সুন্দর এক পুকুরে স্নান করছে। দেশে আছে বাবা। চল চল, সবাই মামাবাড়ি চল। উম্‌-এর সময় সকলকে পরিস্কার হতে হয়।

(৩৯)

সারিম্‌ সারিম্‌ সানম্‌ সারিম্‌
সাতিয়ানা রে
বাড়গিরে রেইতুরি
গুচুয়ানা রে।

টীকা : বাঁধনা গান। সব বাড়ির ছাদ বা চালের ওপর ঢালু কিনারা আছে। তেমনি জমি বা ভিটাতে রাইসরষে আছে। সরষেগুলোতে গোঁফের মত আঁশ লেগে আছে।

(৪০)

টিয়াল টিয়াল মুন্‌গা জয়েন
সেনাউরি হেন্দা সারি হো
লে লেইক্কান নেরা দৈ হেওয়ান
সেনাউরি হেন্দা সারি হো।

টীকা : বাঁধনা গান। 'দুরুম্‌জা' নাচের গান। নাচতে নাচতে মোড়লের বাড়ি যাবার সময় এই গান গাওয়া হয়। এর সাথে যে বিশেষ নাচ হয় তাকে বলে 'দুরুম্‌জাএনেই'। সজনে গাছে ফল এসেছে। (পূর্বতন প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করছে প্রেমিকাকে) তোমার স্ত্রী কি গর্ভবতী হয়েছে বা সন্তানবতী হয়েছে, গানের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হচ্ছে। বাঁধনার সময় গাওয়া হয়।

(৪১)

খুন্টি দাদা তুদ্‌মে সে
গাডা দাদা ভাতা মেসে
দিসামপতি রাজ দাদায়
দাড়ায়ে কান
হাতি দাদা খাড়ি গুজুকতায়।

টীকা : বাঁধনা গান। 'খুন্টো'-র পরদিন (সহরায়/বাঁধনা) 'পারগানা'র লোক এসে বলছে খুঁটিটাকে তুলে দিতে, মাটি বুজিয়ে দিতে। কারণ সহরায় পরব সমাপ্ত। হাতির পিঠে চড়ে এসে খবর দিচ্ছে। দিসামপতি রাজার প্রাচীন কিংবদন্তীর উল্লেখ গানটিতে রয়েছে।

(৪২)

কুলিমুচান রেদো তোকোয় মিনায়া
কুলিমুচান রেদো রাণী মিনায়া

রাণী কোরাম রেদো সার পড়াওয়ে।
কুলিমুচান রেদে তোকোয় মিনায়া
কুলিমুচান রেদো উদাই মিনাই
উদাই কোরাম রেদো সার পড়াওয়ে।

টীকা : সহরায় গান। গ্রামের রাস্তার শেষ মাথায় কে আছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে রানী আছে। রানীর বুকে সবাই মিলে তীর দিয়ে আঘাত করবে। গ্রামের শেষ প্রান্তে কে আছে। গ্রামের রাস্তার শেষে বা প্রান্তে রাজার শত্রু আছে। গ্রামের সবাই তাকে তীর দিয়ে মারবে।

(৪৩)

এ বাবা দিরিহি বাবা হে বাবা গ্রোখাবাবা
লাহ্‌তাইনম বেঙ্গে দেরে দ
তোকোই বাবা পান্‌জা কিলাং।

টীকা : সহরায় গান। শিকার যাবার সময় এই গানটি গাওয়া হয়। হে দ্রিহি বাবা, তুমি আগেপিছে দেখ। কেউ যদি আমার পিছনে থাকে।

(৪৪)

এ বাবা দিরিহি বাবা এ বাবা গোরখা বাবা
বারবিলা নারা আলে মে
বারবিলা নাড়া আলে মে।

টীকা : সহরায় গান। শিকারের গান। হে দ্রিহিবাবা, গোরখাবাবা, সকাল থেকে দুপুরবেলা (বারবেলা) পর্যন্ত শিকার চলেছে। এই গানটি বাঁধনা পরবে 'সাকরাতে'র দিন গাওয়া হয়। গানের শেষে গ্রামের সীমানা অবধি নাচতে নাচতে যাবে, দুরুমজা, দং, লাগরেঁ নাচ করবে। ফেরার সময় বাঁধনা।

(৪৫)

কুল্‌হি কুল্‌হি তে দো
সাঁকে দারান্ কান্
সাঁকেরিয়ান মালাবারেম
কোয়য়েং খায় দ।
বালেকা জার ডর
লিকাইং লেওয়ের
লেওয়ের দ।

টীকা : বাঁধনা গান। হাঁসের গলায় একটা সাধারণ দাগ থাকে মালার মত। সেরকম মালা যদি আমার গলাতেও থাকত তাহলে আমি আনন্দে নাচতাম।

(৪৬)

তুমদা বাবু গোগবেনসে
নীল গামছা লা দিবেনসে

চিতানটোলা লীল কুড়িকিন
ছিল্‌বিলোক্কান।
তুম্‌দা নেওগো বালিং গোগা'
লীল গামছা বালিং লাদে
চিতানটোলা লীলকুড়ি হো
বালিংদহ কিন্।

টীকা : বাঁধনা গান। বাবু, তুমি মাদল দুটো ঘাড়ে নাও। নীল গামছা গায়ে নাও। উপর পাড়ার দুটি মেয়ে খুব চঞ্চল, ছটফটে। ছেলেরা বলছে, আমরা মাদল নেব না, নীল গামছা গায়ে নেব না। ওপর পাড়ার মেয়েদুটিকে আমরা রাখব না।

(৪৭)

হরে নিঙ্গা নাপা জাড়ি লিকা
নিরে নিঙ্গা নাপা বানু কুতিংআ
নামদোরে যুগীনিরে
নিঙ্গা নাপাম নাগু লিকু খান
হটোরিয়া মাদালিতেন্ জীবদানেয়া
নিঙ্গাই নাপুই নাতুরে
তুমদা ঠামাক সাভি কান্দেবাবা
নেহোলেং নাপুইন বারেং তাহেলেনখায়
নেহোলেং বারেংবারে তাহেলেনখায়
গেল্ খোজে খোজেই
গেল্‌বার খোনে বাণিজ আগুইং

টীকা : বাঁধনা গান। ঐ গ্রামে বাঁধনা চলছে। মাদলের শব্দ হচ্ছে। এক মেয়ের কেউ নেই, বাবা মা নেই। কে ডাকবে তাকে? মেয়েটি ভাবছে, বাবা-মা থাকলে তাকে ডাকত, গ্রামে সে কতরকম নাচগান করত।

(৪৮)

য়ুমিং মারাং সেরমা পুরী
য়ুমিং মারাং ধরতি পুরী
তোকোই নাইগোই বিনাউলেদা
সের্‌মারে্‌মা জোলু নিপিল
ধরতিরেমা মানেওয়া কো
সেরমারমা জুলু নিপিল
তোকোই নাইগোই বেনাউলেন কো
সেরমা ধরতি ইঁয়েঁলকু রেদো সারিসুহানেন্।

টীকা : বাঁধনা গান। এত বড় আকাশ, এত বড় পৃথিবী! কে সৃষ্টি করেছিল এই আকাশের তারা নক্ষত্র। কে সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর মানুষ। ওই আকাশ ও পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে আবাক বিস্ময়ে মন আনন্দে ভরে যায়।

(৪৯)

তুকারে জাগোঁসাই মান্‌ওয়া জনম্ দ
তুকারে দ জাগোঁসাই মান্‌ওয়া নোপেল দ
হিহিড়ি রে মান্‌ওয়া জালাচেতান রে
জালাচেতান রে মান্‌ওয়া কারাম মা দারি দ
ওনামা চেতান রে হাসিল চেঁড়ে বেলে
লেদাওনা রেগে মান্‌ওয়া নাপে জনম্ দ।

টীকা : বাহা গান। কোথায় মানুষের জন্ম, সৃষ্টি হল কোথা থেকে। জলের ওপর ঢামনার, ঢামনার ওপর করম গাছ সৃষ্টি, তার ওপর হাসিল পাখি ডিম পেড়েছিল। তার ওপর মানুষের জনম। ওর থেকেই তোমাদের সৃষ্টি হল।

(৫০)

জালামা চিতান রে জা মানোয়া
জালামা চিতান রে জা মানোয়া
কারাম মা দারি দ।
কারাম মা চিতান রে যা মানোয়া
হাঁসিল চেঁড়ে বেলি লে দা
ওনা রিগি যা মানোয়া
নাপে জনম দ।
ওনা রিগি যা মানোয়া
নাপে নুপেল দ।

টীকা : বাহা গান। জলের ওপর করম গাছ। তাতে হাঁস ডিম পেরেছিল। ওর ওপরই তোমার জন্ম।

(৫১)

চিকাতে নোপেলিনা মিত বিতে ধর্‌তি
মিত বিতে ধর্‌তি দ।
চিকাতে জনম এনা
জুরি সারজম দারি দ।
জালামা চিতান রে নুপেল এনা
মিত বিতে ধর্‌তি দ।
ধর্‌তি মা চিতান রে
যা মানোয়া জানাম না
জুরি সারযম দারে দ।

টীকা : বাহা গান। কি করে জলের ওপরে মাটি সৃষ্টি হল। ধরতির ওপর জোরা শালগাছ সৃষ্টি হল। নিরাকার পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হল। পৃথিবীর ওপরে জোড়া শালগাছ সৃষ্টি হল।

(৫২)

চিকাতে ধর্‌তি টারহাওয়েন
চিকাতে সেরমা সিপিং ইয়েন
মিনাই মিনাই যা মানোয়া
কাছিম মা কুমারী
উনি মা চিতান রে
যা মানোয়া ধর্‌তি টারহাওয়েন।
ধরতি মা চেতান নে
যা মানোয়া রেইমত মা লেনডং দ
উনি মা চেতান রে
যা মানোয়া সেরমা সিপিং ইয়েন।

টীকা : বাহা গান। জলের ওপর পৃথিবী কী করে আটকাল। আকাশ কী করে আটকাল। আছে আছে কাছিম কুমারী। তার ওপরে পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। মাটির ওপরে কেন্নোর ওপর আকাশ থেমে আছে।

(৫৩)

তকোই মা চান্দোই রাকাব এন
অথ ডিগির ডিগির হালে
সেরমা বারাং বারাং
সিং মা চান্দোই রাকাব এন
অথ ডিগির ডিগির হালে
সেরমা বারাং বারাং
তকোই মা চান্দোই হাসু রেন
নথ ডিগির ডিগির হালে
সেরমা বারাং বারাং
ঞিন্দে চান্দোই হাঁসুরেন
নথ ডিগির ডিগির হালে
সেরমা বারাং বারাং

টীকা : বাহা গান। কোন চাঁদ উঠছে। মাটিতে আলোর তাপ আসছে। তাতে মাটি শক্ত হল, দিনের সূর্য উঠে মাটিকে তাপে শক্ত করল। কোন চাঁদ ডুবল। রাতের চাঁদ ডুবল। ধীরে ধীরে মাটি, আকাশ উত্তপ্ত হল।

(৫৪)

তোকোই কুকু চিয়ে লেদা
বির দিসেম দ

তোকোই কুকু সেগুন লেদা
নাতুমা ডিহের্‌লি
মোরেঁকুকু চিয়ে লেদা
বির দিসেম্‌ দ
তুরুই কুকু সগুন লেদা
নাতুমা ডিহের্‌লি
তোকোয় মেদয় রেন্দ লেদা
বির দিসেম্‌ দ
তোকোয় কুকু চুকুন লেদা
নাতুমা ডিহের্‌লি
মরেঁ কুকু রেন্দ লেদা
বির দিসেম্‌ দ
তুরুই কুকু চুকুন লেদা
নাতুমা ডিহের্‌লি।
সার লেহো সগুন লেহো
বির দিসেম দ
রেন্দ লেহো চুকুন লেহো
নাতুমা ডিহের্‌লি।

টীকা : বাহা গান। কে কে দেখেছিল জঙ্গল। কে কে গিয়ে বসবাস করল। (গ্রামের গণ্যমান্য) পাঁচজন দেখেছিল, ছয়জন মিলে বসতি স্থাপন করল।

(৫৫)

তোকোই মেদোয় গেঁছ লেদা
লেম লাতার দ
তোকোই মেদোয় গুড়ি লেদা
জাম্বির লাতার দ
নায়কি নেরায় গেই লেদা
লেম লাতার দ
গোসাই নেরায় গেম্মে লেদা
জাম্বির লাতার দ
গেঁছ লেহো গুড়ি লেহ
লেম লাতার দ
হোটাগ লেহো পসির লেহো
জাম্বির লাতার দ।

টীকা : বাহা গান। জাহের থানে পবিত্র গাছের নীচে লেপনকার্য হচ্ছে। জঙ্গল কোদাল দিয়ে সাফ করে জল দিয়ে পরিষ্কার করা হল। তারপর গোবর দিয়ে লেপন করা হল। জাম্বির গাছেব তলায় নায়কির স্ত্রী লেপনকার্য করল। গ্রামের এক স্ত্রী নায়কির স্ত্রীকে সাহায্য করল।

(৫৬)

তোকোই কুকু নরং আহো
বির বিরিয় তিরিয় দ
তোকোই কুকু সাঁহেঁ দাহ
নাতুনরি সাকুয়া দ।
মরেঁকুকু নরং আহো
বিরবিরিয় তিরিয় দ
তুরুইকুকু সাঁহে দাহ
নাতুনরি সাঁকুয়া দ।

টীকা : বাহা গান। কে কে জাহের থানে বাঁশী বাজাচ্ছে। কে কে দিরিং বাজাচ্ছে। পাঁচজনে জঙ্গলে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। ছয়জন বাজাচ্ছে দিরিং। ফুঁ দিয়ে বাজাচ্ছে।

(৫৭)

তোকা ঘাট্‌রে নুম্‌কানা
নাতু নাইকে
তোকা ঘাট্‌রে নার্‌কান
কান নাইকে নেরা
সিতল ঘাট্‌রে নুম্‌কান
নাতু নাইকে
মেরাল ঘাটরে নারকান
কান নাইকে নেরা
নুম কাতে নারকা কাতে
নাইকে রাচায় দুরুপয়া
নায়কি দ তেহেন দ
চটি রেগি নিহেঁড় কান।

টীকা : বাহা গান। কোন ঘাটে গ্রামের নায়কি স্নান করছে। কোন ঘাটে নায়কের স্ত্রী স্নান করছে। শীতল ঘাটে গ্রামের নায়কে স্নান করছে। মেরাল ঘাটে তার স্ত্রী স্নান করছে। স্নানের পর গ্রামের অঙ্গনাতে চটির ওপরে নায়কে বসল। সেদিন তারা পৃথকভাবে অবস্থান করবে।

(৫৮)

কুতুরু সিতা গালাং গুলং
গৈঠা লেপি লাপালোপো
দেলাং হো সেন্দরা হো
দেলাং হো কার্‌কা
তোকোর তাম যা হেঁড়েল
কুলোই মান্দাল দ

তোকোর তাম যা হেঁড়েল
চিত্রি ফড়ি দ
নাগু কিদৈং যা নেঢ়া
কুলোই মান্দাল দ
সেটের কিদৈং যা নেঢ়া
চিত্রি ফড়ি দ
কোটি তালাং যা হেঁড়েল
কুলৈ মান্দাল দ
সামাক তালাং যা হেঁড়েল
চিতরি ফড়ি দ
কুটি কিদৈং যা নেঢ়া
কুলৈ মান্দাল দ
সামা কিদৈং যা নেঢ়া
চিতরি ফড়ি দ
নুতুই তলাং যা নেঢ়া
কুলৈ মান্দাল দ
রাসি তালাং যা নেঢ়া
চিত্রি ফড়ি দ
নতুই কিদৈং যা হেঁড়েল
কুলৈ মান্দাল দ
রাসি কিদৈং যা হেঁড়েল
চিতরি ফড়ি দ
যম তালাং যা হেঁড়েল
কুলৈ মান্দাল দ
চপৈ তালাং যা হেঁড়েল
চিতরি ফড়ি দ
যম কিদৈং যা নেঢ়া
কুলৈ মান্দাল দ
চপৈ কিদৈং যা নেঢ়া
চিতরি ফড়ি দ।

টীকা : বাহা গান। ছোট ও বড় কুকুর নিয়ে শিকার। পাখি উড়ছে। চল হে শিকার করতে। কি কি আনা হল শিকার থেকে। (স্ত্রী বলছে) কই তোমার চিতরি পাখির মাংস। শিকারী স্বামী বলছে, খরগোশ ও চিতরি পাখির মাংস এনেছি। স্ত্রী বলছে, কেটে কেটে সেগুলি খণ্ড করতে। স্বামী বলছে, আমি খরগোশ কেটে খণ্ড করলাম, চিতরি কাটলাম। তরকারি রান্না কর খরগোশ দিয়ে, ঝোল রান্না কর চিত্রি পাখি দিয়ে। স্ত্রী বলছে, খরগোশের তরকারি ও চিতরির ঝোল রাঁধলাম। খেয়ে নাও স্বামী, হাড় চুষে খাও। স্বামী বলছে, খেয়ে নিলাম, হাড় চুষে খেলাম।

(৫৯)

মড়েঁ সিঞ মঁড়েং ইঁন্দ
সেঙ্গেল দা দয়
ঝড়ি লেদা হে
সেঙ্গেল দা দয়
ঝড়ি লেদা মানোয়া
তোকারেবেন তাঁহে নাহো
তোকারেবেন সোরোলেনা
মিনা মিনা ধিরিদান্দির
মিনা মিনা নাঙ্গির চাকির
মানোয়া ওণ্ডে গিলিং
তাঁহে কানাহৌ
ওণ্ডে গিলিং সোরোলেনা
হুরুমে হুরুমে গেই মা সারকি লো
হারামা লাতারে ভিন্দেরেন বিদ্‌কি।

টীকা : বাহা গান। পাঁচদিন পাঁচরাত। পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই পাপ মোচন করতে আগুনের বৃষ্টি হয়েছিল। আগুনের জল ঝড়ছে, মানুষ দুজন (পিলচু হারাম, পিলচু বুড়ি) তোমরা কোথায় ছিলে। নাকি কোথাও ঢুকে ছিল, লুকিয়েছিলে। পাহাড়-পর্বতে, গুহায় লুকিয়েছিলাম। মানুষ আমরা ওখানেই ছিলাম। ঐখানেই লুকিয়েছিলাম। তারপরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি আগুনের তাপে লাল হয়ে গেছে। গরুটাও তাপে লাল হয়ে গেছে। নালীর নীচে মেয়ে মহিষ উল্টে গেছে।

(৬০)

হেঁসা বুটৈ তেঙ্গোলেন হেঁসা মায়াম্
জরো ওদিং
বাড়ি বুটৈ দুরুপলেন
বাড়ি মায়াম জড়ো ওদিং
ঝারপি লো হিসা হালে
ঝারপি লোমবাড়ি।

টীকা : বাহা গান। পাকুড় গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। পাকুড়ের রস আমার ওপর পড়লে। বটগাছের নীচে বসেছিলাম। বটের রস পড়ল আমার ওপর। বড়ো ঝাড় হয়ে গেছে বট ও পাকুর গাছের।

(৬১)

হিসামা চোটে রেন জা গোঁসাই
তুদে মায় রাগে কান

বাড়ি মা লাবির রেন জা গোঁসাই
গুতরু মেঁদে সাঁহেদা
দেশ চং নাচুরেন জা গোঁসাই
দিশাম চং বিহুরেন জা গোঁসাই
গুতরু মেঁদে সাহেদাং।

টীকা : বাহা গান। পাকুর গাছের ওপরে 'তুদ' পাখি কাঁদছে। বট গাছের নীচে গুতরু পাখি নিঃশ্বাস নিচ্ছে। দেশ তো ভরে গেছে ভগবান। গুতরু পাখি দম নেবে। দেশে ঘুরছে, শঙ্খ বাজাচ্ছে।

(৬২)

তোকা দাঢ়ে তিত্‌কিন্ হো
তোকা দাঢ়ে সসবত্
কুইন্দা রে তিত্‌কিন্ হো
ডাডি দাঢ়ে সস্‌বত।

টীকা : বাহা গান। কোন জলে স্নান করলে। কোন জলে ডুব দিলে। কুয়োর জলে স্নান করলাম, ডাডির জলে ডুব দিলাম।

(৬৩)

নোডোং তালাং যা সারো
ডুব্বো সুনুম দ
নুডুং তালাং যা সারো
কুন্দোর নাকি দ
নুডুং কিঁদেং যা নাজিং
ডুব্বো সুনুম দ
বাহের কিঁদেং যা নাজিং
কুন্দোর নাকি দ
নাজোক তালাং যা নাজিং
ডুব্বো সুনুম দ
গিরান তালাং যা নাজিং
কুন্দোর নাকি দ
নজৌ কিঁদেং যা সারো
ডুব্বো সুনুম দ
গিরান কিঁদেং যা সারো
কুন্দের নাকি দ
নুডুং তালাং যা সারো
লুমং লুগুড়ি

বাহের তালাং যা সারো
সিন্দুর শাড়ি
নুডুং কিঁদেং যা নাজিং
লুমং লগুড়ি
বাহের কিঁদেং যা নাজিং
সিন্দুর শাড়ি
বান্দি তালাং যা নাজিং
সিন্দুর শাড়ি
কাসুই তালাং যা নাজিং
লুমাং লগুড়ি।

টীকা : বাহা গান। দিদি বলছে, বের কর ডিব্বা থেকে তেল, বের কর কুন্দোর চিরুণি। বোন বলছে, বের করলাম দিদি ডিব্বার তেল, কুন্দোর চিরুণি। দিদিকে ডিব্বার তেল মাখিয়ে এবং কুন্দের চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে বলছে বোন। দিদি বোনকে মাথার চুলে তেল মাখিয়ে চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিল। তারপর দিদি বোনকে 'লুমং লগুড়ি' ও 'সিন্দুর শাড়ি' বার করতে বলল। এই বস্ত্র পরে তারা যাবে জাহের থানে। দুই বোন এই বিশেষ শাড়ি ও লগুড়ি পরে বেরোবে।

(৬৪)

দিলাং সারো হো সারো নেলগো দুদ্রং
নোরা রেমা আন্হারিং
দুয়োরিমা উঁইহারিং
চিলি চিকাইন নুডুং হালে
চিলি চিকাইন বাহে।
চিকাতে হো ছিতা তাইওমেন্
চিকাতে হো কাপুম বিলম্মেন্।
মান্দরমুলি গাথাও তিগিং তাইওমেন
নুংদু বাহা গুতুই তিগিং বিলম্মেন।

টীকা : বাহা গান। জাহের থানে বোনকে নিয়ে যাবে বলে দিদি আহ্বান জানাচ্ছে। সেখানে নাচগান চলছে। ঘরে আছে শাশুড়ি, দুয়ারের বাইরে আছে শ্বশুড়। কিন্তু আজ আমাদের কেউ কিছু বলবে না। তবু সেখানে যেতে অনেক বিলম্ব হল। একটি মেয়ের নাম ছিতা, আরেকজন কাপুম। ফুলের মালা গাঁথতেই দেরী হয়ে গেল।

(৬৫)

যাম নাইরে কুরি কিন
সিঙ্গার নাই রে
সিঙ্গার নাই রে কুরি কিন

বাহা নাই রে
বাহা নাই রে কুরি কিন
সিঙ্গার নাই রে
সিঙ্গার নাই রে মানা
কাঁরা কাড়াই যবে আকান
দেন সেনা খেরচোকপি
নোতে কতিন্ মে
যাং মেজা হারাম রাপা
ডুকেন মাঙ্গেয়া।

টীকা : বাহা গান। চল চল মেয়েরা, নদীতে চল, সিঙ্গার নদীতে যাও। ফুল নেই মেয়েদের হাতে। সিঙ্গার নদীতে একটা বুড়ো কানা মোষ ডুবে আছে। একটা কাটারি দাও, বুড়োটাকে কুপিয়ে মারব।

(৬৬)

তোকোয়া রাচারে নারঙ্গি
পুণ্ডিঘোর সাদম্ দ
তোকোয়া বাটে রে নারঙ্গি
পিয়েরের ঘুড়ি
নায়কি মা রাচারে নারঙ্গি
পুণ্ডিঘোর সাদম্
নায়কি মা বাটেরে নারঙ্গি
পিয়েরের ঘুড়ি।
তোলাইতাম তোলাইতাম
ঘুঘুরা ঘুঘুরা নারঙ্গি
পুণ্ডিঘোর সাদম্ দ
নিহেরাঁইতাম নিহেঁরাইতাম
পিয়েরের ঘুড়ি
লিক্কিন দে লিক্কিন দে নারাঙ্গি
পুণ্ডিঘোর সাদম্ দ
দামোগে দামোগে নারাঙ্গি
পিয়েরের ঘুড়ি।

টীকা : বাহা গান। কাদের অঙ্গনায় সাদা ঘোড়া ও ঘুড়ির পায়ে ঘুঘুরা বা ঘুঙুর বাঁধা হল। সেই ঘোড়াগুলিকে নাচানো হবে। নায়কি ঠাকুরের বাড়ির আঙ্গিনায় সাদা ঘোড়াগুলি রাখা হল নাচনোর জন্য, ঘোড়া ও ঘুড়ির গলায়, পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে নাচানো হবে।

(৬৭)

তোকোয়া বান্দেলা রে দাসিম
দয়ইয়ুনু মিনা হো
সেরলিদৈ চাপি ইন্না দা সিন্দে
ইয়ুনু মিনা তুনুমেপে হোউ।
সেরা লিদৈ চাপি ইন্না চাপুয়েপে হে।

টীকা : বাহা গান। নায়কির বাঁধ, বিল বা পুকুরে দুটি পাখির কথা বলা হয়েছে। কার বাঁধে ঢুকেছে দাসিম পাখি। সেই বাঁধে বা পুকুরে দাসিম ডুব দিয়েছে (মাছ খাবার জন্য)। সেরালি জলের ওপর উড়ছে। সেরালি ডুবে মাছ ধরে না, দাসিম ডোবে।

(৬৮)

দিলা সে মান্‌ঝি বাবা দিলা হাজুকবেন্‌
দিলা সে মান্‌ঝি গোঁগো দিলা হাজুকবেন্‌।
মানওয়া লে হোহোয় দা জাহের তালা রে
দিলা সে জাহের নেঢ়া দিলা হাজুকবেন্‌
দেলা সে গোঁসাই নেঢ়া দিলা হাজুকবেন্‌।
মানওয়া লে হোহোয় দা জাহের তালা রে
দেলা সে মোঢ়েঁ বোয়হা দেলা হাজুক বেন্‌
মানওয়া লে হোহোয় দা জাহের তালা রে।

টীকা : বাহা গান। মাঝি, বাবাঠাকুর ও গোঁগো (গঙ্গা) দেবীর পূজার জন্য জাহের থানে আহ্বান জানিয়েছে সবাইকে। নায়কি, তার স্ত্রী, গ্রামবাসী সবাইকে ডাকা হচ্ছে। তারা এলে তবেই পূজা শুরু হবে। গোঁসাইকেও ডাকা হচ্ছে।

(৬৯)

তাঁহারেতাঁ নানাত্রানা তাঁহারেতাঁ নানা হো...
পুরুইও হয় দ পুরুইও পোরোয়
পছিও হয় দ হালায়ে হালায়
নে তাপে সুনুম মে সিন্দুর
নে তাপে আইনম কাজার
নাতাং তাপে সুনুম মে সিন্দুর
দিলৈ তাপে আয়নম কাজার
নাতাং কিদালে সুনুমে সিন্দুর
দিলৈ কিদালে
মোঢ়ে কোদোঁ মোঢ়েঁ বোয়হা
তুরুই কোদোঁ তুরুই বোয়হা।
নাতাং কিদালে সুনুমে সিন্দুর
দিলৈ কিদালে আয়নম কাজার।

টীকা : বাহা গান। নায়কি জাহের থানে তেল, সিঁদুর, কাজল পূজায় অর্পণ করেছে। পূবদিকে থেকে পশ্চিমদিকে প্রচুর হাওয়া বইছে জাহেরথানে। দেবতারা অর্পিত দ্রব্য গ্রহণ করেছেন। গ্রামের পাঁচজনা মিলে, গ্রামের ছয়জনা মিলে অর্পণ করল।

(৭০)

কোইআলাং হো নাজিং কোইআলাং
মোঢ়েঁ গোটেই হো নাজিং সারযোম বাহা
বাহায় আলাং হো নাজিং
মোঢ়েঁ গোটেই নাজিং সারযোম বাহা
গোছায় আলাং হো নাজিং সারযোম বাহা।

টীকা : বাহা গান। পূজার পর নায়কি ঠাকুরের কাছে ফুল চাওয়া হচ্ছে। এই ফুল নিজে নেওয়া যায় না, নায়কির কাছ থেকেই নিতে হয়। শাল ফুল দেওয়া হয় দেবতার কাছে। সেই ফুল সবাই যত্নে ঘরে রাখে।

(৭১)

তিং এ্যলাং হো-নাজিং সুতোম গানারি
চাপা দালাং হো নাজিং হাকু গণারি
নো রলাং হো নাজিং সুতোম গণারি
রাকাবালাং হো নাজিং হাকু বালে মাঙ্গরি।

টীকা : বাহা গান। গানটিতে মাছ ধরার জালের কথা বলা হয়েছে। দিদিকে সুতা দিয়ে মাছ ধরার জাল বুনতে বলছে বোন। সেই জাল জলে ফেলে তারপর তাতে টান দিতেই 'বালে মাঙ্গরি' মাছ উঠে এল।

(৭২)

লোগু বুরু করলে মাতকোম হো
হোয় আতে লিও দ
ঘন্টাবোঢ়ি চাউলি সারযম হো
তাল্‌শিওয়াতে তাওয়ে
লোগুবুরু করলে মাত্‌কম্‌ হো
দিপিল কাতে পেরে য
ঘন্টাবোঢ়ি চাউলি সারযম হো
সিপিং কাতে সাড়ির ঢ়।

টীকা : বাহা গান। পাহাড়ের ওপর মহুয়া গাছ আছে। হাওয়ায় এত ফুল ঝরে পড়ে যে মাথায় ডালি নিলে তা ভরে যাবে ফুলে। লোগুবুরু পাহাড়ের কথা বলা হচ্ছে। বিহারে ঘন্টাবোঢ়িতে আবার প্রচুর শালগাছ আছে, সেখানে হাত বাড়ালে শালফুলে পূর্ণ হবে।

(৭৩)

তোকেয়ং রচা রে দা ভুম্ভু কেন
মানা চাউলি বুহের লেন
নায়কি আং রাচা রে দা ভুম্ভু কেন
মানা চাউলি বুহেরলেন।

টীকা : বাহা গান। যখন অনুষ্ঠান (বাহা) আরম্ভ হয়, তখন নায়কির বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যগীত।

(৭৪)

তাঁহারতা নানাত্রাণা তাঁহারিতা নানা হো...
তোকারবু জনম্ লেনা ধর্‌তি মানোয়া
চিতিকিরা ডররেহো চেঁরেবিলি খন
জালারেবু জনম লেনা
করমেকা ডর্‌রেহো চেঁরেবিলি খন।
তোকোই দেবা নইয়ুর তিবু হারাবুরু লেন
লিটে গোঁসাই নইয়ুর তেবু হারাবুরু লেন।

টীকা : বাহা গান। মারাংবুরুকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কোন ডিম থেকে আমাদের (মানুষের) জন্ম, করম ঠালের মধ্যে বাসায় যখন ডিম পারল, তা থেকেই মানুষের জন্ম। মারাংবুরুর হুকুমেই জন্ম। লিটে গোঁসাই দুজনকে দুই খাওয়াত।

(৭৫)

তোকোই জনম ধর্‌তি
তোকোই জনম পিরথিমি
তোকোই জনম্ ধরতি মানোয়া হর
হরো বিনা ধরতি
লেঙেক বিনা পিরথিমি
হাঁস হাঁসিলি চেঁড়ে জনম মানোয়া হর।

টীকা : বাহা গান। কার জন্ম ধরতিতে, কার জন্ম পৃথিবীতে। কচ্ছপের উপর মাটি, কেঁচো মাটি রাখল কচ্ছপের পিঠে তাতেই করম গাছ জন্ম নিল, তাতে হাঁস হাঁসিল পাখির ডিম থেকে মানুষের জন্ম হল।

(৭৬)

কুলহি মুচান রে তুরু দারে
বাহাও্য়া কাঁন্দে যেঙ্গে যেঙ্গে
হেন্দে কাহু দৈ মে না
জিলিং যো মা জিলিং যো মা
লিল্‌হা দম বিধুয়া দম

ভিঙ্গরে দম বাং কান
বাহা কানা কাহু বাহা কানা।

টীকা : বাহা গান। লাল লাল ফুল হয়েছে গাছে। লাল ফুলকে কাক মাংস ভেবে ভুল করেছে, মাংস খাবার ইচ্ছা হয়েছে তার। কাককে এজন্য বোকা, জরুয়া, নির্বোধ বলা হয়েছে। কাক কানা হয়ে গেছে বলে ফুলকে রক্তমাখা মাংস ভেবেছে, লালফুলকে না চিনে খেতে গেছে।

(৭৭)

সকাম সকাম সাগে নেন
সনাম সকাম সাগে নেন
ফুলু পূজা দিন্ দ সেটেরিনা
সকাম সকাম সাগে নেন
মরেকু তুরৈকু পুজা কুইঞাম কান
পিতল্ ফুঁরু রে দা কুইঞাম।

টীকা : বাহা গান। নতুন পাতা বেরোল, নতুন ফুল এল গাছে। ফুলপুজার দিন চলে এল। এদিন মরেকু তুরৈকুর পূজা হবে। কাঁসাপিতলের পাত্র দিয়ে জল ঢালা হবে। সব গাছেই নতুন পাতা এসে গেছে।

(৭৮)

নায়কি সিনান কর নায়কি মানান কর
নায়কি পূজোয় মাহা থান
নায়কি ইয়াজ কাল দিন
নায়কি হরেকরকম ফুলু রে
হরেকরকম ফুলু নায়কি
পূজোয় মাহা থান।

টীকা : বাহা গান। নায়কিকে স্নানকর্ম সমাধা করে মান্তি করতে বলা হচ্ছে। তারপর মহাথানে যাবে নায়কি পূজা দেবার জন্য। অনেকরকম ফুল রয়েছে, সেই ফুল দিয়ে নায়কি মহাথানে পূজা দেবে।

(৭৯)

আঙ্গানাত্ গো আঙ্গানাত্ ডিগিমিগি আঙ্গানাত
জাহের নিলায় আঙ্গানাতে ফুলু পুজোয় দিন
বাবলু মাঝি আঙ্গানাতে পুজোয় লালে লাল গোই
জাহের নিলায় আঙ্গানাতে পুজোয় চাঁপা ফুল
বাবলু মাঝি আঙ্গানাতে পূজোয় লালে লাল গোই
জাহের নিলায় আঙ্গানাতে পূজোয় চাঁপা ফুল।

টীকা : বাহা গান। ঐ ঋতু আসছে। দারুণ ফুলের ঋতু আসছে, ফুল পূজার দিন আসছে।

জাহের থানে ফুল দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের মোড়ল বাবলু মাঝি, সে লাল ফুল দিয়ে পূজা করছে। জাহেরে চম্পা ফুল দেওয়া হয়েছে।

(৮০)

আটে আটে বিরায় আইলম
গোটা আটে বিরায় আইলম
মনের মত মালা পাইলাম না
একটা কালো ছোঁড়া
বেলামাল নিলে রে
গোটা বাজার মন্ যাছো হে।

টীকা : চড়কের গান। হাটে হাটে বেরিয়ে আসলাম, খোঁজ নিলাম, কিন্তু মনের মত মালা পেলাম না। একটা কালো ছেলে বেলফুলের মালা নিল।

(৮১)

নাইয়ো দিলে সরু সুতা
বাবা দিলে পাওলা মালা
ভাই দিলে ভোরবারির মালা
যার সঙ্গে তিরে যুগে
রিবি গো রিবি গো
তাকে দিলে প্রমজিলের মালা।

টীকা : চড়কের গান। মা সরু সুতা দিল। বাবা দিল পাওলা মালা ও ভাই দিল ভোরবারির মালা। যার সঙ্গে তিন যুগের সম্পর্ক তাকে দিলাম প্রেমজালের মালা।

(৮২)

নাওয়া নাওয়া ডাঙ্ দাদা
নাওয়া নাওয়া খুন্টি
চর্খি রানে ভানে
ডাঙ্ উপর ভক্তা যো পড়িল
পাণ্ডা কেমন মাহাদেব।

টীকা : চড়কের গান। নতুন নতুন 'ডাঙ' (চরকের ওপর ঘূর্ণন দণ্ড) দাদা, নতুন খুঁটি (শালকাঠের) চরকে ঘুরছে। 'ডাঙ'-এর ওপর থেকে ভক্তা পড়ে গেল। তাহলে হে মহাদেব, কেমন তোমার পাণ্ডা যে ভক্তা পড়ে গেল।

(৮৩)

ফাল্নামাঝি ভোক্তাগিরি
বালেবাবু হাঁসুয়া লে লে

দানা কাটি যায় হো
দানা যো কাটালাং
দানা যো মুঠোভরি রাখালাং
দানা যো মাথা ভরি আনালাং
সেই দানা গাঁথালাং
সোনে কিরি মোউ্‌রা,
সেই মোউ্‌রা পহিরালাং।
শির রে বাঢ়া দে
জল খাইতে যাবই
থান নাজ্জো হুই।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। কোনো এক মোড়লের ভক্ত বালেবাবু। তাকে বলা হচ্ছে, তুমি হাঁসুয়া নাও, ধান কাটতে যাওয়া হচ্ছে। ধানের দানা কাটা হল। মুঠো ভরে রাখা হল। মাথায় করে বয়ে আনা হল। সেই দানা রাখা হল, সাফাই করা হল। এবার ধানকে গোলাজাত কর, আমি জল খেতে যাব।

(৮৪)

জুড়ি সিতা হোকিন রুওরিনা রে
আতুরিন কোরাহুকু সেটেরিনা রে
নিঞরেনজুরি বাবায় তোকায়ইনা রে
নেতম্ তিমা কুলায় বহু
কোঁইয়েতিমা মারাঃ
সার বহুলিং নারা কেরঃ
বকোইং কোরাম রেদো বহু
সার পারাওয়েন্।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। শিকারের গান। একদিন শিকারে স্বামীর সঙ্গী দুটি কুকুর ফিরে এল, গ্রামের লোকজন ফিরে এল। তবু স্বামী কেন এল না, তারই দুশ্চিন্তা গানটিকে আচ্ছন্ন করেছে। ডানদিকে খরগোশ, বাঁয়ে ময়ূর। দাদার তীর ভাইয়ের বুকে লাগল। বধু গাইছে গানটি তার ভাশুরকে লক্ষ্য করে। সুর হবে বাঁধনার। বাঁধনা পরবে 'সাকরাতে'র দিনও গাওয়া হয়।

(৮৫)

জিল্‌দো গোগে পেহো দিসেম হোরতে
বকোইং গোগে পেহো নাতু হোরতে
জিল্‌দো দোহইয়েপ্পে দিসেম হোরতেন
বকোইং দোহইয়েপ্পে নিন্‌য়া রাচারে
জিল্‌দো গেদে পেহো দিসেম হোর্‌তে
বকোইং তোপায়য়েপ্পে নাতু হোর্‌তে।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। শিকারের গান। শিকারে দাদার তীর ভাইয়ের বুকে লেগে ভাই মারা গেছে। মৃত ভাইকে গ্রামের লোক ঘাড়ে করে আনবে, হরিণের মাংস আনবে বাইরের লোক। হরিণের মাংস থাকবে বাইরের ডেরায়, ভাইকে রাখা হবে নিজ আঙ্গিনায়। হরিণের মাংস বাইরের লোকজন কাটবে। ভাইকে গ্রামের লোক মাটির নীচে পুঁতে দেবে। বাঁইনা পরবে 'সাকরাতে'র দিনেও গানটি গাওয়া হয়।

(৮৬)

কুরিদোকু সামাং কিদা
পুরুব পচ্ছিম উত্তের দাখিন
কোরাদোকু সামাং কিদা
চান্দোই রাকাব চান্দোই হাসুরেন।

টীকা : বিয়ের গান। লাগড়েঁ গান। সূর্য যেদিকে উঠেছে, মেয়েরা সেদিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেরা তাকাচ্ছে সূর্যাস্তের দিকে, পশ্চিমদিকে।

(৮৭)

হোডিং হুডিং জানুম দারে যযতে
লিউওইনা বাবা
রাসিনা তো কুরিকোরাকু
ছাউনিয়া কানা
নাদোং দুকু টিরিনা নাদোং
দুকু নাপিরিনা
নাদোং দুকু হারাল চিটল্ রে।

টীকা : বিয়ের গান। কুলগাছ ফলে পূর্ণ হয়ে নুইয়ে পড়েছে, তেমনি ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নাচগান করছে। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ নাচছে, কেউ বা চলে গেছে।

বিয়ের গান

(৮৮)

ছামে ডা লাতারে মাণ্ডেওয়া লাতারে
কুড়ুকুড়ু মান্দারিয়া বলোয়িনা
ইং দৈন মেন্‌দা চিলে
রাস্কা তিগেই কাডাকুড়ু বাড়াইকান।
যাতিরিগি ভালাই কুডুগিয়া।

টীকা : বিয়ের গান। বিয়েতে গাছের 'ঠাল' দিয়ে মারোয়া বানানো হয়। মাদল বাদকরা সেখানে ঢুকেছে। কিন্তু একজন বাদক সোজা দাঁড়িয়ে মাদল বাজাচ্ছে না, নীচু কুঁজো হয়ে বাজাচ্ছে। মেয়েরা সবাই এর কারণ খুঁজতে গেছে। কিন্তু তারা দেখল, লোকটাই বাঁকা আছে, অর্থাৎ শারীরিক ত্রুটিযুক্তি।

(৮৯)

নাবেনবাবু মাদরিয়া
তুমদা বেন রুরুকান
ডাণ্ডারে ঘেঁচমাল বানুতাবেন
দিলাইং নিদিবেন্
যাই নগর বাজারতে
ডাণ্ডারে ঘেঁচমালাইং
কিরিং আবেন।

টীকা : বিয়ের গান। তোমরা দুজন মাদল বাজাচ্ছ, অথচ তোমাদের কোমরে মালা নেই। নগরের বাজারে গিয়ে তোমাদেরকে মালা কিনে দেব। মেয়েরা বলছে, চল তোমাদের কোমরের মালা কিনে দেব। কোমরে বিশেষ ধরনের পয়সার মালা পরে মাদলবাদক। সেই মালার কথা বলা হচ্ছে।

(৯০)

তোকোয় এঞাং রাচা রে দা বুড়ুকেন
মানা চাওলি বুহেরলেন
ফালনা এঞাং রাচারে দা বুড়ুকেন
মানা চাওলি বুহেরলেন।

টীকা : বিয়ের গান। কার বাড়িতে বিয়ে শুরু হল, পচানি খাওয়া চলছে। তাদের ঘরে সেদিন থেকে খাওয়া দাওয়া শুরু হল। সেই গৃহে যা কিছু পচানি ছিল লোকজনকে খাওয়াতে খরচা হয়ে গেল।

(৯১)

সুনুম সাসাং আজোঃকাতে
চেদা হপন মোয় কোচেইনা
কোচে বাংখান দৈঞ চিকা আ
জুরি পারিরে কুসি বানুই।

টীকা : বিয়ের গান। তেল-হলুদ মাখানোর পর কন্যা অসম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ল। মা জানতে চায়, ছোট মেয়ে কেন অমন করে মাথা নাড়ল। যারা তেল মাখাচ্ছে তারাই জানায় যে, পাত্র তার অপছন্দ। তাই কন্যা মাথা নাড়ছে।

(৯২)

ছামেডা লাতারে মাণ্ডেওয়া লাতারে
তোকোই সিরিঙ্ লিদা সেরমা টুঙ্গোউ
নিংগিচো মারাং দাদা বার গেলে রেংলেই
নিংগি সেরেং লেদা সেরমা টুংগোউ।

টীকা : বিয়ের গান। মারোয়ার তলায় ছেলেমেয়েরা নাচগান করেছে। একজন জিজ্ঞাসা করেছে গানে, কে গান গেয়েছিল। উত্তরে বলছে, আমি দুই ছেলের মা গান গেয়েছি। আকাশ-পাতালের মত লম্বা গান গেয়েছি।

(৯৩)

কুল্‌হি কুল্‌হি বেড়াইলম্
বাড়ি বাড়ি পুছাইলম্
কাকারিও ঘরে যে আছে কুমারী।

টীকা : বিয়ের গান। বেহাই আসছে কন্যাগৃহে। রাস্তায় আসার পথে এই গান। কোন ঘরে, কাদের বাড়িতে কন্যা আছে তা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসা করে বেহাই পৌছালো কন্যাগৃহে।

(৯৪)

কাঁহা সাহি আইলে কুটুম
কাঁহা সাহি ঠাট ভেলায়
ঘর সাহি আইলে কুটুম
তোহোর সাহি ঠাট ভেলায়
গড সাহি ধোয়াই কুটুম
চট সাহি বিছাই কুটুম
উয়ার সাহি বৈঠা ভেলাই।

টীকা : বিয়ের গান। বেহাই বেহানীর গান। দুই কুটুম কথাবার্তা বলছে। কোথা থেকে আগমন, কোথা থেকে এসে দাঁড়ালে। ঘরে থেকে আগমন। কার সঙ্গে সম্পর্ক হবে, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। তোমার পা ধুয়ে চট বিছিয়ে দিলাম। সেখানে বসো।

(৯৫)

তাহারি এনানানা হো...
পোয়াল য়ানো পোয়াল য়ানো
জগমাঝি বাবা হো
কুটুমকে ভালা দে বিছাই দে
পোয়াল য়ানো পোয়াল য়ানো
জগমাঝি বাবা হো
কুটুমকে ভালা দে বৈসো

টীকা : বিয়ের গান। বিয়েতে কুটুম্ব এসেছে, জগমাঝি তাদেরকে আপ্যায়নের জন্য, বসতে দেবার জন্য সবাইকে অনুরোধ করেছে। বিবাহের সময় বরের পিতা ও কনের পিতার পোয়ালে বসা বাধ্যতামূলক।

(৯৬)

কে কে যো মাচি বোসো
কে কে গানডো বৈ সো
কে কে যো পালাকে উপুর
মামা বালাজো গান্‌ডো বৈসো
কাকা বালাজো মাচি বৈসো
মূল বালাজো পালাকে উপুর।

টীকা : বিয়ের গান। কাকে কোথায় বসতে দেওয়া হবে সেকথা গানটিতে বলা হয়েছে। মামা, কাকা ও প্রধানকে পিঁড়িতে, মাচায়, পালঙ্কে বসানোর কথা বলা হয়েছে।

(৯৭)

হিন্দা ও বালা কোরা
জিউয়ি যাতি দবোগিসে বা
নাপে নাসিরবাদ (আশীর্বাদ) চান্দো দোহাইতে
জিউয়ি যতি হর্মোহার্তা
দলে বোগিগিয়া।

হিন্দা হো বালা কোরা
জিউয়ি যাতি হর্মোহার্তা বুগিসেবা
আপে নাসিরবাদ চান্দো দোহাইতে
জিউইযাতি হর্মোহার্তা
দলে বোগিগিয়া।

টীকা : বিয়ের গান। বেহাই বেহানির পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা ও উত্তরদান করা হয়েছে গানটিতে।

(৯৮)

চান্দো রাকাম কান পিড়িংপিরি
নিংকো সাজাও কিদিং দোউরায় চিতান
দোউরা চিতান খনিং হো হো লিদা
তোকায় ইনাপিনা গাতে কুরি
মিনা লেগিইয়ানা গাতে কুরি
কুডম সাতে জাপ্পা যেরে
চিকামিয়ালেনা দোউরারেন হর।

টীকা : বিয়ের গান। সিঁদুরদানের গান। সূর্য উঠছে, অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। কনে ডালির ওপর

বসে, সে তার বান্ধবীদের ডেকে বলছে, তোমরা কোথায় গেলে, আমাকে সে দেউরাতে সাজিয়ে দিল। তখন তার গ্রামের বান্ধবীরা গানে বলছে, তুমি তো ডালির ওপর বসে আছ, আমরা কী করব।

(৯৯)

তোকোয় লা লেদা বান্দেলায় বাঁধ
জগমাঝি লা লেদা বান্দেলায় বাঁধ
চিকায় লাগি জগমাঝি বাবা
বান্দেলায় বাঁধ লা লেদা
হেন্দায় বাবা জগমাঝি চিকানলাগি
বান্দেলা বান্দেম লালেদা
অপরি বিত লাগি দ
লাতিসুতোম তিজ লাগি
তাম্বাপয়সা দহয় লাগি
মীদপটম্ পুরিয় সিন্দুর
লে পুজোয় লাগিদ
বান্দেলাবান্দে লা লেদা।

টীকা : বিয়ের গান। জলবিহা। কে খুঁড়েছিল গর্ত। জগমাঝি খুঁড়ছে। কীসের জন্য খুঁড়ল গর্ত। কীসের জন্য বাঁধ খুড়েছিলে, তিনটে তীর পুঁতেছিলে। তামাপয়সাটা ওর মাঝে রাখা হবে। কাঁঠালপাতায় পুরিয়া সিঁদুর রেখে ঐ গর্তে দিয়ে পূজা করা হবে। সেইজন্য গর্ত খোঁড়া হল। তিনকোণায় তিনটে তীরকে লাতিসুতো দিয়ে বাঁধা হয়।

(১০০)

হর্ দকু মেনা খজড়ি
হুরু বাংখাং দ খজরি বাং
হর্ দকু মেনা বালায়া বালায়া
হপন বাংখান দ বালায়া বাং।

টীকা : বিয়ের গান। ধান ছাড়া কি মুড়ি হয়। ধান ছাড়া মুড়ি হয় না। লোকে বলে বিহাই বিহাই, ছেলে না হলে বিহাই হয়? ছেলেমেয়ের বিয়ে হলে তবেই বিহাই হয়।

(১০১)

কাটিক কাটিক রে বিহই
গিজরা লাং নেপেস্লেন
বালায়া দ বিহই বালাংরপ্পর
কামকাজ দ বিহই নাচুর জং পে
বালায়া দ বিহই বালাং রপ।

টীকা : বিয়ের গান। বেহাই বেহানকে বলছে, ছোটতে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কামকাজের কথা বউকে বলবে। আমার সাথে কাজিয়া করো না। আমাদের মধ্যে যেন কোনো মনোমালিন্য না হয়।

(১০২)

হেও লিদিং নাইয়োগ হবর লিদিং
তোকোর নাইয়োগ দাড়িম যম্‌লেন
বাড়িয়াত উঠাক ঠাক
বাজ্‌নিয়ার লিকির লিকির
নে গৈ নুলো কাতাম নুনোটাকা

টীকা : বিয়ের গান। বিদায়ের গান। এতদিন আমায় মানুষ করলে, খাওয়ালে পরালে, কিন্তু আমার কাছে তো কিছুই খেলে না। তাই তোমার দুধের দাম আজ দিয়ে দিলাম।

(১০৩)

নিঙ্গাইং নাপুইং দ নাগুিকিন বাডায়্‌য়া
তালাইং ঞিন্দো কিন্‌ বিদোকাদিন্‌
নালোসেমরাগ বিটি
নালোসেম হামেরা
নেতোম্‌ কইঞে গাতি কুরি
তাইনম্‌ রে তোক্‌ নিয়েং তিঙ্গোয়াকান্‌।
সেটের্‌মে গিয়েং বিটি যাওয়াইনোরা।

টীকা : বিয়ের গান। বিদায়ের গান। অনেক রাতে বিদায় অনুষ্ঠান হচ্ছে। মেয়ে তাই আক্ষেপ করে বলছে, মা-বাবা হিংসায় এত রাতে বিদায় দিল। ভাই বলছে, না, বোনের এই আশঙ্কা ভুল। বোনের কোনো ভয় নেই, কারণ—ভাই বোনকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আসবে।

(১০৪)

তুকাতে মাইকো এদিমকানা
আডি সাঙ্গিং দদা গাডা পারোম
ডাডা দা মাচো মই বগিতেম্‌ বতর্‌
সাহেবলৌকো দাদা লেগেম লেগেম।

টীকা : বিয়ের গান। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করছে, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? উত্তরে মেয়েটি বলছে, অনেক দূরে, নদীর ওপারে। ছেলেটি জানায়, নদীর জল তো ভয়ংকরী। মেয়েটি জবাব দেয়, সাহেবের নৌকায় চড়ে যেতে খুব ভালো লাগে।

(১০৫)

নিঙ্গাইং নাপুইং দ নাগুিকিন বাডায়্‌য়া
হারাম জাঁওয়াঁয় রেকিন

জাঁওয়াঁয়কাদিঞা
হর্‌তে হেজুকসেনো হরদুকু কুলিঞা
নুই দুমই তোকোইকানা
লাজাও তেইং লইকিদা গড়ম্‌বাবা।

টীকা : বিয়ের গান। একটি মেয়ে বলছে, আমার মা-বাবা এক বুড়োর সাথে বিয়ে দিল। বুড়ো স্বামীকে দেখিয়ে লোকে তার পরিচয় জানতে চাইলে লজ্জায় সেই মেয়ে উত্তর দেয়, এটা আমার বড়োবাবা (দাদু)।

কোরা গীতি

(১)

আজো তো কারাম গোঁসাই মাঝ কুল্হি ই্আওয়ে
আন্দিনে কারাম গোঁসাই বনে বনে ঘোরে
আজো তো কারাম গোঁসাই মাঝ কুল্হি আওয়ে।

টীকা : কারাম গান। আজ কারাম গোঁসাই মাঝ রাস্তার এসেছে। অন্যদিনে সে বনে বনে ঘোরে। আজ সে মাঝরাস্তায়।

(২)

কাতেক ডালে রে হাতি কাদো লেতায় রে
কাদো লেতায় রে
কাতেক ডালে রে হাতি বন সামায় রে
বন সামায় রে।

টীকা : কারাম গান। কিসের ভয়ে হাতি, তুমি কাদায় লুকালে। কিসের ভয়ে হাতি তুমি বনে লুকালে।

(৩)

হাতি চেরি আওই কারমা হো ধারমা
হাতি চেরি আওই চিতা মোহন সাজাওই।
হাতি চেরি আওই কারমা ও ধারমা
হাতি চেরি আওই চিতা মোহন সাজানি।

টীকা : কারাম গান। হাতির পিঠে চড়ে কর্মা-ধর্মা আসছে। হাতির পিঠে চড়ে সুন্দর সাজগোজ করে দুই ভাই কর্মাধর্মা আসছে।

(৪)

দাদা হে দাদা কারাম কাটিদে
ভোজি রে ভোজি ডালা ভুনি দে

টীকা : কারাম গান। দাদা গো দাদা, তুমি করমের ডাল কেটে এনে দাও। বৌদি গো, তুমি আমায় ডালা (পূজার জন্য) বানিয়ে দাও।

(৫)

এহিয়ো গাঁওয়াকের দে ভাদারাম হে
গেরি মাটি ল্যাখালে পুঁড়ের
নওয়া জাগাতে দেওয়া পিঁরিয়তে বাঁধায় হে

গোরি মাটি দেশারে তোরে
ল্যাখালে পাঁড়ের দেশা রে তোরে
দেবোগে পার্‌বেতি সিঙ্গাহারা মুরুগা
কান্টা মোর দিয়া সারে সারে
কান্টা মোর দিয়া সারে সারে।
হেরিয়ারা গোবরা হরারে আঙ্গানা
নিপ্পাল ওরে ঘাটেরে মাঠেরে
হেরিয়ারা গোবরা হারারা আঙ্গানা
নিপ্পাল ওরে ঘাটেরে মাঠেরে
হওয়েদে বিহান বেটি পাসারা তো হেটিয়া
ওরে ঘাটোরে মাটোরে।

টীকা : কারাম গান। এই গ্রামে কারাম হবে, তাই গোবর দিয়ে ঘর, প্রাঙ্গন লেপন করা হচ্ছে। গহনা পড়ে সাজসজ্জা করে পূজায় বসছে মেয়েরা। প্রাঙ্গন আজকে মুছে শস্যের পিঁড়ি বসালাম। পিঁড়া বাঁধলাম, মাটিতে থান বাঁধলাম। গেরি মাটি দিয়ে মুছলাম। পারবেতি বলে মেয়ে ব্রতীদের, ওরো মুরগা বলি দিচ্ছে। বাতি জ্বালানো হবে সারি সারি।

(৬)

কাঁসি হে কাটিকুটি নোকে বেনাইলু
তেঁহি চেঢ়িয়েতে ছোট
ভেয়া ভাদার এল লেনিয়া
নকোয়া রে নকোয়ারে শাশো বাঢ়ায়তে
মোর শাশু পিড়হুঁয়ে নুকায়ে
মোর ভেয়া ভুঁয়ে বেসি
খেতে ভাদার এল লেনিয়া
কাঁসি হে কাটিকুটি নোকে বেনালু
তেঁহি চেঢ়িয়েতে ছোট
ভেয়া ভাদার এল লেনিয়া
যাখান ভেয়া আবে
কুল্‌হিয়েকে মুড়্‌হিয়ে
তখন শাশু লোটেইয়ে নুকায়ে
ভাদার এলো লেনিয়া
নকোয়া হে নকোয়া রে শাশো বাঢ়ায়তে
মোর ভেয়া ভুঁয়ে বেসি
খেতে ভাদার এল লেনিয়া
যখন ভেয়া আবে
ঘরওয়া কে দুরিয়ে

তখন শাশো থারিয়ে নুকায়ে
ভাদার এলো লেনিয়া
নকোয়া রে নকোয়া রে শাশো বাঢ়ায়তে
মোর ভেয়া তুম্বে পানি
পিতে ভাদার এল লেনিয়া।
মোর ভায়া পাতে ভাতা
খেতে ভাদার এল লেনিয়া।

টীকা : কারাম গান। কাঁসিফুল কেটেকুটে নৌকা বানালাম। তাতে চড়ে ছোট ভাই ভাদ্র মাসে বোনকে এসেছে নিতে। নকোয়া রে নকোয়া, আমার শাশুড়ি তখন পিঁড়ি লুকিয়ে দিল, ভাইকে বসতে দিল না। ভাই তখন মাটিতেই বসল। যখন ভাই এল, তাড়াতাড়ি করে তখন শাশুড়ি লোটা লুকালো। ভাই যখন ঘরের দুয়ারের কাছে এল তখন শাশুড়ি জল খাবার পাত্র লুকালো। ভাই আমার তুম্বায় (লাউয়ের খোল) করে জল খেল। পাতায় করে ভাত খেল।

(৭)

হাসি হাসি খায় একা
দহি দুধা ভাতা
কান্দি কান্দি মাঙ্গো হে
লেন্‌হিয়ারা।

টীকা : কারাম গান। হেসে হেসে ভাই দই দুধ খায়। কেঁদে কেঁদে বোনকে নিয়ে যেতে চায়।

(৮)

দারাসে চঢ়িয়ে দেখে
বুড়ি হে মাইয়া
আবে বেটি পোঁহুচালায়
আবে ভাদারি এল লেনিয়া
গোবরা বাহ্‌রাতে দেহে
বারোকি হে ভোজি
আবে বেরিণ পঁহুচালায়
আবে ভাদারি এল লেনিয়া
মতু কান্দো মতু খিজো
ছোটকি হে ভোজো
ভুন্‌জালা বালা ফাঁকি
যেবে ভাদার এল লেনিয়া।

টীকা : কারাম গান। দূর হতে বৃদ্ধা মা দেখছে যে মেয়ে এসে পৌছিয়েছে। ভাইয়ের সাথে সে গৃহে এসে পৌছাবে এখনি। ঘর থেকে বড় বৌদি ও ছোট-বৌদি ননদকে আসতে দেখে বিশেষ খুশী হয়নি।

(৯)

আজো তো কারাম গোঁসাই মিয়া বাপা ঘর
কালো তো কারাম গোঁসাই যেয়ো সোসুরাইল।

টীকা : কারাম গান। আজ করম গোঁসাই মা-বাবার ঘরে এসেছে। কালই তো করম গোঁসাই তার শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে।

(১০)

দেশে দেশে কান্দায়ে পারবেতি বেহিন গো
বনে বনে কাঁদো হে কারাম জী হে রাম
কিয়া দিয়ে বঁদাবো পারবেতি বেহিন গো
কিয়া দিয়ে বঁদাবো কারামে গোঁসায়েরা
ক্ষীরা ওখ্‌রি বঁদাবো কারামে গোঁসায়ে রাম
ফুলে ফুলে বঁদাবো কারামে গোঁসায়ে রাম
দুধে ভাতে বঁদাবো পারবেতি বেহিন গে
ধুপে দীপে বঁদাবো কারামে গোঁসায়ে রাম।

টীকা : কারাম গান। দেশে দেশে পারবেতি বোনেরা কাঁদছে, আর বনে বনে কাঁদছে করম। কী দিয়ে বোনকে বোঝাব, আর কী দিয়ে পূজা করব করম গোঁসাইকে। শশা, মুড়কি দিয়ে বোনকে বোঝাব, দুধে-ভাতে বোনকে বোঝাব। ফুল দিয়ে, ধূপ দীপ দিয়ে করমকে বোঝাব।

(১১)

এতো বড়ো নাগরি
কোয়েনা সভা বৈসে
হায় হায় দয়া
বোতোলাকে তেলাও্য়া
বোতোলাহি রহি গেল্‌
হায় হায় দয়া
ডালিয়া কে লুগুয়া
ডালিয়হি রহি গেল্‌
হায় হায় দয়া।

টীকা : কারাম গান। এত বড় নগরী, কেউ কোথায় সভা বসায়নি বা একত্রিত হয়নি, হায় দয়া। বোতলের তেল বোতলেই রয়ে গেল। ডালির কাপড় ডালিতেই পড়ে রইল, হায় দয়া।

(১২)

নাজারো দিয়া লো নাজারো বাতি
যাগারে রাগালে দিয়া রে
ছামোকে লাগালো বাতি

নাজারো দিয়া লো নাজারো বাতি।
তেলি ঘর্গা তেলা
ধোবি ঘর্গা বাতি
নাজারো দিয়া লো নাজারো বাতি।

টীকা : কারাম গান। দিয়া বাতি তোমরা পুড়ে শেষ হয়ে যেয়ো না। তোমরা জ্বলতে থাকো। তেলি ঘরের তেল, ধোবি ঘরের বাতি, তোমরা জ্বলতে থাকো, নিভে যেয়ো না।

(১৩)

গেরাম লাগি হামে ডারওয়া বৈ সা
ওয়ালোবিজিগ্ তৈ তাওয়েবে
এতে নাজা নানো হামে গেরামওয়া
ওয়ালোবিজিগ তৈ তাওয়েবে
বাঙ্সিঙ লাগি হামে ডারাওয়া বৈ সা
ওয়ালোবিজিগ তৈ তাওয়েবে
এতে নাজা নানো হামে বানসিংওয়া
ওয়ালোবিজিগ তৈ তাওয়েবে
কারাম লাগি হামে ডারাওয়া বৈ সা
ওয়ালোবিজিগ তৈ তাওয়েবেন।
এতে নাজা নানো হামে ডারাওয়া বৈ সা
ওয়ালোবিজিগ তৈ তাওয়েবে।

টীকা : কারাম গান। গারাম বা গ্রামদেবতা, বাঙসিঙ দেবতা ও করমদেবতার আরাধনা করা হচ্ছে গানটিতে। করম ব্রতে 'ভরন' নামার সময় গানটি গাওয়া হয়।

(১৪)

সাগো হৈতে হেনো বিষ চুলোতে না মিলেন বিষা
ছুইয়ো না লো বন্ধো বনাইলো
কত ইন্দ্রেতে জাগলো সুন্দরী
চুলো হৈতে হেনো বিষ কাপ্লাতে না মিলেন বিষা
বন্ধো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
কাপ্লা হৈতে হেনো বিষ চোখোতে না মিলেন বিষা
বন্ধো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
চোখো হৈতে হেনো বিষ মুখোতে না মিলেন বিষা
বন্ধো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
মুখো হৈতে হেনো বিষ ঘ্যাঁচাতে না মিলেন বিষা
ছুইয়ো না লো বন্দো বনাইল
কত ইন্দ্রেতে জাগলো সুন্দরী

ঘ্যাচা হৈতে হেনো বিষ হাঁসলিতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
হাঁসলি হৈতে হেনো বিষ ছাতিতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী।
ছাতি হৈতে হেনো বিষ পেটাতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
পেটা হৈতে হেনো বিষ কোমরে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
কোমর হৈতে হেনো বিষ জাঙ্গাতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
জাঙ্গা হৈতে হেনো বিষ গুন্টিতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
গুন্টি হৈতে হেনো বিষ নাসাতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
নাসা হৈতে হেনো বিষ সুপ্তিতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী
সুপ্তি হৈতে হেনো বিষ মাটিতে না মিলেন বিষা
বন্দো বনাইলো কত ইন্দ্রে জাগলো সুন্দরী।

টীকা : ঝাড়নি গান। সাপের বিষ ঝাড়ার সময় এই গানটি গাওয়া হয়। স্বর্গ থেকে শরীর বেয়ে মাটিতে বা পাতালে বিষ নামানো হচ্ছে।

সহরায় সঙ্গীত

(১৫)

ওরে রামা রে হরি রে
লাতা হো পাতা হো
গাইয়া যে চাড়াল গেলে
রানে বানে আর
ভেসি যে চাড়েল গেল
কোশ নেদি পার
রামা রো হরি রে ওরে
কোন্ শিং-এ মাখাবে
কুরঞ্জি কে তেলা ওরে।

টীকা : সহরায় গান। হে রাম, হে হরি, বনে জঙ্গলে গাই চড়াতে গিয়ে সে ভেসে গেল কোশ নদীতে। এখন কোন শিং-এ করঞ্জ তেল মাখাব। সহরায় পরবে গাওয়া হয় গানটি।

(১৬)

সারাগেতে জল নাই
পিরথিমিতে চাষ নাই
রামোরাম বিনায়ে বিনায়ে
চাষা কান্দে রে।
রামো রাম ইয়ালে বেসিয়ে
কিসান কান্দে রে।

টীকা : সহরায় গান। স্বর্গেতে জল নেই, পৃথিবীতেও চাষবাস বন্ধ। চাষী তাই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। আলে বসে কৃষক কাঁদছে।

(১৭)

রামা রে হরি রে রারা রে।
ঢুকে যাব মাহাতো কে ঘারারে
ভিতার মাহালা হে ওরে
রামা রে হরি রে রারা রে।

টীকা : সহরায় গান। হে রাম, মাহাতোর বা প্রধানের ঘরের ভিতর ঢুকে যাব। সহরায় পরবে গানটি গাওয়া হয় মাহাতোর গৃহে প্রবেশের সময়।

(১৮)

এ হিয়ো গাওয়াঁকের দে ভাদারাম
নাওয়া না জেনিয়া তোহোর শ্রীরাম
শঙ্খের গোরি মাটি লেশালে পাড়িঁ
কাঁচহিঁ দুধা দেওয়া পেরিয়ে পাকার
শিবা শঙ্খের
উটালো দুদ্ধা আপা বোর (আপামর?)

টীকা : গারামপূজার গান। গ্রামের সকলকে বলা হচ্ছে, ভাদ্রমাসে শ্রীরামকে প্রণাম করতে। পিঁড়া বা ডালি বানিয়ে শঙ্খ, গেরিমাটি দিয়ে সকলে প্রণাম করা হল। কাঁচা দুধে দই বসানো হল। সকলে মিলে শিবশঙ্করের পূজা দেওয়া হল।

(১৯)

দেলিয়ো হে দেওয়া
শিঙা হারা মুরোগা
কাঁটা মোর দিয়া সারে সার
শিবা শংকর।

টীকা : গারামপূজার গান। শিবশঙ্করের পূজা হচ্ছে। সেখানে বিশেষ মুরগা বলি দেওয়া হল। সারি সারি প্রদীপ জ্বালানো হয়।

(২০)

নাহি দেখাল যাহো হাই ইস্‌কুল কলোজে
হায় হো কোরা সমাজ যোগুণে বহায়।
নাহি দেখাল যাহো আদালতে অপিসে
হায় হো কোরা সমাজ যোগুণে বহায়।
হায় হো আদিবাসী যোগুণে বহায়।

টীকা : শিক্ষা ও প্রতিবাদমূলক গান। কোরা সমাজ যৌবনে বয়ে গেল, ভেসে গেল। এ সমাজে কাউকে হাইস্কুল, কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করতে, বা আদালত-অফিসে কাজ করতে দেখা গেল না। আদিবাসী সমাজ যৌবনেই ভেসে গেল।

(২১)

দেখোরে ভাই হাকিম কি তামাসা
দেখো রে ঝুরজাঙ্গাল কাটিকুটি
মানুষ করে বসালো রে
দেখোরে ভাই হাকিম কি তামাসা।

টীকা : শিক্ষা ও প্রতিবাদমূলক গান। হাকিমের তামাশা দেখ ভাই। জঙ্গল কেটেকুটে মানুষ বসতি করল। এখন হাকিমের প্রহসন দেখ।

(২২)

সরকার কে মুলুক মাটি
কোনে ঘুরাওয়ে লাঠি
ওরে ভাই কোনে মা রাতে
নেয় না বান
সরকারকে মুলুক মাটি
পাবলিক উড়াওয়ে লাঠি
ওরে ভাই বেশি মা
রাতে পিস্তোল গুলি
ওরে ভাই পুলিশ মা
রাতে নলবুন্দুক।

টীকা : শিক্ষা ও প্রতিবাদমূলক গান। সরকারের মাটি। তাকে ঘিরে লাঠি-বান-পিস্তলের লড়াই। পুলিশকে চালাতে হয় নলবন্দুক। রাতের অন্ধকারে চলছে প্রাণান্তক লড়াই।

(২৩)

ঝাড় জাঙ্গাল কাট কুনে
কারালুঁ মায় বাসা
দেখো রে ভায় হাকিম কে তামাসা
সুখাল রুটি ভুকাল কোরা

কোরা কাটে মাটি
দেখোরে ভায়া
হাকিম কে তামাসা

টীকা : শিক্ষা ও প্রতিবাদমূলক গান। জঙ্গল কেটে আমরা বসত গড়লাম। এখন হাকিমের তামাশা দেখ। শুকনো রুটি, অভুক্ত কোরা সমাজ। মাটি কাটছে কোরারা। দেখো ভাই, হাকিমের তামাশা।

(২৪)

জামুন পাকা কা লেপিয়া
রাসা বোনা বেন্দিয়া
সামদি ডরিয়ে নেয়ার
জামুন কা পাকা লেপিয়া
রাসা বোনা বেন্দিয়া
সাম্‌দিন ডরিয়ে নেয়ার।

টীকা : বিয়ের গান। (বেহাই বেহানিকে বলছে) তুমি জামের ডালটা নামিয়ে দাও। রসার বনে সেই ডাল থেকে পাকা জাম আমি খাই। বিবাহে বেহাই-মিলনের সময় গাওয়া হয় গানটি।

(২৫)

সাম্‌দি সঙ্গে বেসোতি
যুক্তি কথা বলোতি
বলো সামাদিন
দুখো সুখো বাতোত
বোলি দিয়া।

টীকা : বিয়ের গান। সম্‌ধির সঙ্গে বসে সমধিন নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলাবলি করছে। তারা একে অপরের সুখদুঃখের কথা জানতে চাইছে। বিবাহে সম্‌ধি-মিলনের সময় গাওয়া হয়।

(২৬)

লাগানা চুমায়ে গো লাগানা নিহারাবে
বিহা বাবা লাগানা চুমায়ে তো
লাগানা নিহারাবে লো
বাবায় আঁখি নিন্দো নাহি আওয়ে তো
লাগানা নিহারাবে লো
মিয়াই আঁখি নিন্দো নাহি আওয়ে তো
লাগানা নিহারাবে লো
মিয়াই আঁখি নিন্দো নাহি আওয়ে তো
লাগানা নিহারাবে লো
দিহা কাকি লাগানা চুমায়ে তো

লাগানা নিহারাবে লো
কাকি আঁখি নিন্দো নাহি আওয়ে তো
লাগানা নিহারাবে লো।

টীকা : বিয়ের গান। মেয়ের বিয়ে, বাবাকে লগ্ন চুমানোর জন্য বলা হচ্ছে। বাবার চোখে ঘুম নেই। মায়ের চোখেও ঘুম নেই। মাকে লগ্ন চুমাতে বলা হচ্ছে। কাকিও লগ্ন চুমিয়ে দিচ্ছে। কাকীর চোখেও ঘুম নেই। বিবাহে লগ্ন-চুমানোর সময় গাওয়া হয়।

(২৭)

একা কাকা দু টা হামে চুম্‌হা লু
দুবিয়াহে মায়েগে হড়াদি চড়্‌হা
একা বাবা দুটা হামে
একা মায়ে হড়্‌দিচড়্‌হা
একা কাকা দুটা হামে
দেখালু মায়েগে হড়াদি চড়্‌হা
দুবিয়াহি মায়ে হড়দি চড়্‌হা।

টীকা : বিয়ের গান। একা কাকা, আমি দুই, কাকা আমার লগ্ন চুমিয়ে দিল। মা দূর্বাঘাস দিয়ে হলুদ চড়াচ্ছে। একা বাবা, আমি দুই, একা মা হলুদ চড়াচ্ছে। একা কাকা, আমি দুই, দেখলাম দূর্বাঘাস দিয়ে হলুদ চড়াচ্ছে। বিবাহে গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানে গানটি গীত হয়।

(২৮)

জানে দেখুঁ তানে কাঁশি ফুল গো
চেঁরিয়া উড়ালো বাড়ি দুর হ
হায়রে কাঁশি ফুল উড়ে ফুরফুর
খোপয়ে খসালে ডেমো ফুল
আব ছুটি যেত মেয়াবাপাকুল
জানে দেখুঁ তানে কাঁশি ফুল গো
চেঁরিয়া উড়ালো বাড়ি দুর।

টীকা : বিয়ের গান। যেখানে তাকাই সেদিকেই কাঁশিফুল। কাঁশিফুল ফুরফুর করে উড়ে চলেছে বাতাসে। দেখে মনে হচ্ছে পাখি উড়ে যাচ্ছে। বনতুলসীর ফুল মেয়েরা খোপায় গুঁজে রেখেছে। মা বাবার কুল ছেড়ে মেয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ি। গানটি কারাম পরবেও গীত হয়।

(২৯)

আব নুনি যেবে শোশুরায়ল
মেয়া বাপা ঘারে সেরে আন্ধার
কাঁচা দুধ খায়ে বেটি
মানুষা ভেলে হারে বেটি

এতয় দুখ দেঁলে কুষাড় কাড়াল
ও তায় ও বেটি এতয় দুখ দেলেঁ।

টীকা : বিয়ের গান। এবার মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে। ঘরে অন্ধকার হয়ে গেল। মেয়ে কাঁচা দুধ খেয়ে মানুষ হল। খেটে খুটে মানুষ করলাম, সে এত দুঃখ দিয়ে গেল। বিবাহের অনুষ্ঠান গাওয়া হবে।

(৩০)

কাঁচা দুধ খায়ে ছেলামানুষ ভেঁলে
আরে ছেলা এত দুখ দেঁলে
দশ মাস দশ দিন লেয়ে ঘুরালও
বাপে মায়ে জনম দেল
কেন্দ কুঁষাঢ় কারালও
তাইও মন নায় পোলেয়ো
আরে ছেলা এত দুখ দেঁলে।

টীকা : বিয়ের গান। এত কষ্ট করে কাঁচা দুধ খাইয়ে সন্তান বড় করলাম, তবু সে বাবামাকে এত দুঃখ দিচ্ছে। এত কষ্ট করেও তার মন পেলাম না। তাই সে এত দুঃখ দিচ্ছে।

(৩১)

চারিয়ো খুটা কেরি মাড়ওয়া
চারিয়ো কোন্ কালাসা বেসালে
চারিয়ো রাজা উগি গেল
চারিয়ো রাজা ডুবি নেল।

টীকা : বিয়ের গান। চারকোণে খুঁটি স্থাপন করে মারোয়া তৈরি হল। চারকোণে কলসী বসানো হল। চারটে প্রদীপ জ্বালানো হল। যেন চারজন রাজা আলোকিত হল। চার রাজা ডুবে (সলতে) গেল। বিবাহে মারোয়া নির্মাণের, ঘট স্থাপনের সময় মেয়েরা গানটি গায়। মারোয়া পূজার সময় গীত হয়।

(৩২)

নও কাট রে নেওয়া
দেবরে নেওয়া
বরা কে শেশিয়া
তার গাছরে চারলে নেওয়া
কিনে দেব লেবোনিয়া।

টীকা : বিয়ের গান। নখ কাটো নাপিত, তোমায় বরের শাশুড়িকে দেব। তালগাছে চড়লে মাটির ভাঁড় কিনে দেব। নাওয়া—ধোবি অনুষ্ঠানের সময় গানটি গাওয়া হয়।

(৩৩)

এ পারে সারে বন
ও পারে বাঁশের বন
সামধিন কো ফাগুন
হলে রে মিলন।

টীকা : বিয়ের গান। এই পারে শালের বন, ওপারে বাঁশবন, এর মাঝে ফাল্গুন মাসে সমধিমিলন হল। বিবাহে সমাধি-মিলনের সময় গানটি গীত হয়।

(৩৪)

পোখোরে শুখায় গেল
ইন্দারা শুখায়ে গেল
বাপাকে ছেঁতিয়ে
হাদাশে গিরিয়ে গেল
আবে বেটি রাহাঁলে কুঁয়ার।

টীকা : বিয়ের গান। পুকুর শুকিয়ে গেল, কুয়ো শুকিয়ে গেল, বাবার বুক হতাশায় শুকিয়ে গেল, মেয়ে এখনো কুমারী বলে।

(৩৫)

পুরুবি বাহিঁ আলা মালা
পেছিয়োহিঁ আলা মালা
দেক্ষিণাঁহি বেরিশালো মেঘ
পখেরাহিঁ ভরি গেল
ইন্দারা হিঁ ভরি গেল
বাপাওয়াকে ছেঁতিয়ে
ভমরা গুজারি গেল
আবে বেটি হওয়াতো বিহা।

টীকা : বিয়ের গান। পূর্বদিক থেকে বাতাস এল। পশ্চিমে বাতাস দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ দিক থেকে মেঘ আসল। পুকুর ভরে গেল, কুয়ো ভরে গেল। বাবার বুক ভরে গেল। এখন বেটি তোমার বিয়ে হবে।

(৩৬)

আঙ্গান না দুবি বাবা লুহুর
কারে বাড়হালা বেটি বেচি নাড়ায় লেঁ।
এলে দশো কুটুম লাগাল
দুওয়োবিয়া টাকাওয়া লোভে
বেচি নাড়াঁয় লেঁ।

নেওয়া বামনা বেটি মাঁড়োয়াকে তাঁরে
সদরওয়ার কহবরকে তাঁরে।

টীকা : বিয়ের গান। আঙ্গনাতে (প্রাঙ্গণে) দুর্বা ঘাস বাতাসে নড়ছে। কেন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলে বেটি, এখন যে তোমায় বেচতে হবে। পাড়ার দশজনা, কুটুম এল। টাকার লোভে বেচে দিল।

(৩৭)

নাওয়া কাটোরে নেওয়া আঙ্গারি জানি বেরিয়া
দেবো রে নেওয়া বরাকের সেসিয়া
নেওয়া কে জালামালা রানে বানে ভেলয়া
কোরোয়াকে জালামালা ভোরগার ভেলয়া
তার গাছে চড়্হে নেওয়া কিনি দেব লাবোনি
ফুট গেল্ লাবোনি সি ঠায়রাল বালনা।

টীকা : বিয়ের গান। বিয়ে করতে যাবার আগে নাপিতকে নখ কাটতে বলা হচ্ছে। তার পরিবর্তে তাকে উপঢৌকন দেওয়া হবে। নাপিতের ছেলেমেয়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেরায়। কোরার ছেলেমেয়ে থাকে ঘরে। নাপিত তালগাছে চড়েছে রস খাবে বলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেটে সেই রস তার চোখেমুখে পড়ল, এখন সেইটুকুই সে খাবে। নাওয়া-ধোবি অনুষ্ঠানে গীত হয় গানটি।

(৩৮)

মোদোয়া লৈয়ে বেটা রুসালা
পাছু ভেইয়া বেসালায়ে
কোনাসা মারওয়া মোদোয়া
মোদোয়া লৈয়ে বেটা রুসালা
পাছু ভেইয়া বেসালায়ে
তোর শাশো মোদায়ে বেপার কারে
তবে বেটা মোদা পেবে রে
কোনাসা মারওয়া মেসিয়া
মেসিয়া লৈয়ে বেটা রুসালা
পাছু ভেইয়া বেসালায়ে
তোর শাশো চামারে বেপার কারে
তবে বেটা মাসা পেবে রে।

টীকা : বিয়ের গান। শাশুড়ি জামাইকে গুড় ও জল খেতে দিয়েছেন। কিন্তু জামাইয়ের রাগ ও আক্ষেপ তাকে মদ ও মাংস দেওয়া হয়নি বলে। তাই তার মা বোঝাচ্ছেন যে, তোমার শাশুড়ি মদের ব্যাবসা করলে মদ পেতে, মাংসের ব্যবসা করলে মাংস খেতে পেতে। বিবাহনুষ্ঠানে গীত হয়।

(৩৯)

কাঁসা পিতারের বাটি এক বাটি তেল
তেলোয়া দেখিশুনি মেখিয়া গে নুনি
তেলোয়া একে জগোমনি
তেলোয়া দেখিশুনি মেখেয়া গে নুনি।

টীকা : বিয়ের গান। তেলপূর্ণ কাঁসা পিতলের বাটি থেকে তেল সাবধানে দেখেশুনে মাখতে বলা হচ্ছে। কেউ ক্ষতিসাধনের জন্য তেলে কিছু মেশাতে পারে, তাই এই সাবধান বার্তা। বিবাহে বরকনেকে তেল মাখানোর গান।

(৪০)

বড়া পিপারা তার
বেসলো সুন্দারা বর
এলো পাকাল আমাতার জায়

টীকা : বিয়ের গান। বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে সুন্দর বর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। পরে আবার পাকা আমগাছের নীচে বিশ্রাম নিতে গেল।

(৪১)

এতদিনে বুড়ুয়া বক্‌রি চড়াবে
আজ বুড়া কুমা কুন্দে খাওই।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। এতদিন বুড়ো ছাগল চড়াত। আজ বুড়ো বয়সে এই কাজ আর না পারায় ভুট্টা ক্ষেত্রে পাহাড়া দিচ্ছে। জমিতে কাজ করার সময় গাওয়া হয় গানটি।

(৪২)

কোরা কাটে মাটি
কোরিন ঢোয়ে ঠাচালো
শিয়োরে সাঁড়াকে।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। কোরা (ছেলেরা) মাটি কাটছে এবং কোরিন (মেয়েরা) মাথার ওপর সুড়কি নিয়ে যাচ্ছে।

(৪৩)

শিকার কারেল যেবেঁ বন্ধু
শিকার নায় মেরিহাঁ
বিনা শিকারে বন্ধু ঘুরি নায়ইহাঁ
বাঘ ভালুকা হেরিণ বনে
চেল গেলা বন্ধু
বনে খোঁজিয়ে দেখে
শুকুনতলা রানি কান্দে

শিগিনি কে মাঝে
শিকার কারেল যেবেঁ বন্ধু
শিকার নায় মেরিহাঁ
বিনা শিকারে বন্ধু ঘুরি নায় ইহাঁ।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। শিকার করতে যাবে বন্ধু, শিকার মিলছে না, বিনা শিকারে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঘ ভালুক হরিণ বনে চলে গেল। শকুনের মাঝে শকুন্তলা রানী কাঁদে। শিকার না করে বন্ধু ঘরে ফিরবে না।

(৪৪)

জোঁকে কাটাল বিচে ডুবা মে
কেঁসে কাটাব বরা ধান
বরা ধানে নাই কাটলে
চেঁঙ্গের বুত্‌রু
কৈঁসে পসাব হো
জোঁকে কাটাল বিচে ডুবা মে
কেঁসে কাটাব বরা ধান।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। জোঁক কাটছে ডোবার মাঝে, কেমন করে ধান কাটা যাবে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েকে কেমন করে খাওয়াব, ধান না কাটলে।

(৪৫)

নেদিয়া ধারি ধারি
এক চিরা বারি
আর সাঁওয়া ঝারোক
গে নুনি বাঁচে পরাণ।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। নদীর ধারে অল্প জায়গা সেখানেই সামান্য ফসল বুনে ঝেড়ে বেছে তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

(৪৬)

নায় জানু হার জেনতে
নায় জানু কদার পারে
নায় জানু গুণমনি গে সাজানি।
নারায়ণে সিঙ্গাসনে
গোকুলা বৃন্দাবনে
নায় জানু গো গুণমনি গে সাজানি।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। হাল বাইতে জানি না। কোদাল চালাতেও জানি না। কোনো কাজই জানি না, কি করে খাব, নারায়ণ সিংহাসনে, গোকুলে, বৃন্দাবনে। গুণমনি, আমি সাজতেও জানি না।

(৪৭)

ঝারণি কেসে হুয়া বঢ়া উজার
ফুলুয়া রাইত ভেল গিরোহো পাথার
রাতিগে বিছোহে রাঙ্গে রাসিকা ভাই
আর বিহানে বিছোহে রাখোয়াল
তোঁহি গে নানা দো উলায় ভুঞ্জা খেঁই হো।
আর হামু পিবো দারুয়ে চুঁয়ায় হো।

টীকা : বিবিধ গান। কেমন সুন্দর গোটা মহুয়া গাছে ঝাড়ঝাড় ফুল ফুটে আছে। সারারাত ধরে প্রচুর মহুয়া ফুল ঝরে পথ ভরে আছে। রাঙ্গে-রসিকারা সেই ফুল রাতভর কুড়িয়েছে আনন্দে, ভোরবেলা রাখাল বাকী ফুল কুড়িয়েছে। ননদ গো, তোমায় দেব মহুয়া ফুল ভেজে, তুমি তাই খেয়ো। আমি (বৌদি) চুঁয়া মদ বা সুরা তৈরি করে পান করব।

(৪৮)

রাত পোহারা রাত কাটি গেল
তায়ো ধেনী নাহি উঠে
ভোরে ভিনসার ভেল
সুরুজ উঠিয়ে গেল
কোন ধেনী নাহি উঠে দেতো পানি
ঝুমরি কারণে হামে তেজালু পিয়া
তায়ের ধেনি নাহি উঠে।

টীকা : বিবিধ গান। রাত কেটে গেল। তবুও বাড়ির মেয়ে উঠছে না। ভোর হল, সকাল হয়ে গেল। সূর্য উঠল। তবু কেনো মেয়ে উঠছে না। গান শুনতে শুনতে পিপাসা লেগেছে, কে জল খেতে দেবে। ঝুমুর শুনতে গিয়ে প্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করতে হল, তবু মেয়ে উঠল না।

(৪৯)

ছোটে মোটে মেঁহুয়া গাছ
বাবারাল ভায়র গো
টিপোকি টিপোকি মেঁহুয়া
গিরহ সারা রাত
ছোটে মটে মেহুয়া গাছ
বাবারাল ভায়র গো
ডারিডারি ছেলা
বান্ধো পেগোড়িয়া।

টীকা : বিবিধ গান। ছোট ছোট মহুয়া গাছ। তাতে মহুয়া ফুল ভরে গেছে। সারারাত ধরে টিপটিপ করে ঝরছে ফুল। ছেলেরা মাথায় পাগড়ী বেঁধে ডালে ডালে চড়ছে।

(৫০)

কাথে বিনু হে গোপিন
লাগাও ঝুমের হারে দুঃখা কহালন যায়
মান্দের বিনু ঝুমের কেসে লাগাত রে
দাদা হারে দুঃখা কহালন যায়
রেসকা পেলেনি বিনু ঝুমের কেসে
লাগাত ঝুমের হারে দাদা রে
হারে দুঃখা কহালন যায়।

টীকা : বিবিধ গান। কিসের জন্য হে গোপী, ঝুমুর গান শুরু হল, সুখ না দুঃখের গান। মাদল ছাড়া কি ঝুমুর গান হয়। দুঃখের কথা কী বলব। রসিক ও রসিকা ছাড়াকি ঝুমুর হয়?

(৫১)

সান্ধে যে ফুটে হারদি
রাঙ্গাল ঝিঙ্গা ফুল
বিহানে ফুটে লালে শালুকা ফুল
পেনিয়া মে
দিনে ফুটে সূয্যমুখি
ডেমোফুল
বিহানে লালে শালুকা ফুল
পেনিয়া মে।

টীকা : বিবিধ গান। সন্ধ্যাবেলা হলুদ রঙের ঝিঙা ফুল ফোটে। ভোরে ফোটে লাল শালুক ফুল। সূর্যমুখী, বনতুলসী ফোটে দিনের বেলা। শালুক ফুল জলের মধ্যে ফোটে ভোরবেলায়।

(৫২)

শাশ্ রান্ধে লিটিয়া
পুথো রান্ধে পিঠিয়া
আরারি দারারি মেড়ুয়া
পিসাল গে মায়
জারালো গে মায়।

টীকা : বিবিধ গান। শ্বাশুড়ি লিটিয়া রাধছে। বৌমা রাঁধে পিঠে। রান্নাটা নষ্ট হয়ে গেল।

(৫৩)

মহেন্দ্র কিসার সভাপতি দুঃখু সেক্রেটারি
অসীম মাস্টারি নেতা কির্তন
চালা দেখেল যাব গো অব
গোপিন সিঙ্গার কের লে।
সেক্রেটারি আইন বান্ধে

সভাপতি সোই ফারে
অসিম মাস্টার নেতা লো কির্তন
চালা দেখেল যাব গো অব
গোপিন সিঙ্গার কের লে।

টীকা : বিবিধ গান। মহেন্দ্র কিসার, দুঃখু, অসীম মাস্টার, এরা হতে চলেছে সভাপতি, সেক্রেটারি ও নেতা। মেয়েরা, সবাই সেজেগুজে নাও। চল সবাই মিলে দেখে আসি।

(৫৪)

আব না রাহিব রাঙ্গে রসিয়া সাধু সাঙ্গে
রাম গাঁঢ় দিল কৈসে
বুঝাবে হে রাজমহল
তোরে লেয়ে যেব হাম সাধু সাঙ্গে
জাতি বেইরাগি হয়ে
যাব লো সাধু সাঙ্গে
লেছমান সাঙ্গে ফাঁড় দিব
লো সাধু সাঙ্গে।

টীকা : বিবিধ গান। আমি আর থাকব না, তোমার সঙ্গেই যাব। রাম রাজমহল দেখুক। লক্ষ্মণের সাথেও সম্পর্ক রাখব না, আমি বৈরাগী সাধুসঙ্গ নেব।

(৫৫)

লেয়ে উড়াবো হাম আপ্‌নে
নাগারা গে সাজানি
সাজান চেলি জেব হাম
তর সাঙ্গে কাঁচে উমারি গে সাজানি
লেয়ে উড়াব হাম আপনে
নাগারা হে সাজানি।

টীকা : বিবিধ গান। নাগরের সঙ্গে চলে যাব। একে তো অল্প বয়স, তার ওপর সুসজ্জিত হয়ে নাগরের সঙ্গে চলে যাব।

(৫৬)

হাঁতেরো চুড়ি দেবো মুহে মিশিয়া দেবো
আরো দেবো গুলের মালা হে
আরো দেবো শীতল পাটি সিতাকে সিন্দুরা
হাঁতেরো চুড়ি দেবো মুহেঁ মিশিয়া
আরো দেবো হে আঁখে কাজারা
তবে হতে রে যুগল্যে মিলন
হাঁতেরে চুড়ি দেবো মুহেঁ মিশিয়া দেবো
আরো দেবো শীতল পাটি সিতাকে সিন্দুরা।

টীকা : বিবিধ গান। হাতের চুড়ি, মুখের মিশি, ফুলের মালা, শীতল পাটি, সিতাসিঁদুর, চোখের কাজল দেব। তবেই তো হবে যুগল মিলন।

(৫৭)

হার খোঁপা খোল দেবো
সাজানি কাগাজ ফুলা
খোপয়ে মলিন
বন ফুলা খোপয়ে
সুন্দর হে সাজানি হাম
কারব ঘারকে আর্ধাঙ্গিনী।
হার খোপা খোল দেব
সাজানি কাগাজ ফুলা
খোপয়ে মালিন।

টীকা : বিবিধ গান। কাগজ ফুলে সাজানো খোঁপা দেখতে ম্লান, সেই খোঁপা খুলে বনফুলে খোঁপা সাজিয়ে তোমায় ঘরের অর্ধাঙ্গিনী করব।

(৫৮)

এতে রাতি কাকার চেঁঙ্গে কান্দে লো
চেঁঙ্গের মেয়াক এতই রিজ লাগে
আধা রাতি নেচাড়ো মান্দের বাজে লো
চেঁঙ্গের মেয়াক মন নায় থামে
এতে রাতি কাকার চেঁঙ্গের কান্দে লো
চেঁঙ্গের মেয়াক এতই রিজ লাগে।

টীকা : বিবিধ গান। এত রাতে কার ছেলে কাঁদে? ছেলের মায়ের এতই আনন্দ যে অর্ধরাত অবধি মাদল বাজানো দেখছে, ছেলের মায়ের মন ভরছে না। এত রাতে তাই ছেলেকে ছেড়ে ঝুমুরে মেতে উঠেছে সে।

(৫৯)

ভায় হো এসানা আন্ধারাত্
রিজ রাং রাহালো না যায়
এসানা আন্ধারি রাত
নাহি সুজে ডাগার বাট
ভায় হো এসানা আন্ধারি রাত
রিজ রাং রাহালো না যায়।

টীকা : বিবিধ গান। অভিসারের গান। এমন আঁধারে আনন্দ আর ধরে না। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাঘাট অন্ধকার। তবু, আনন্দ আর ধরছে না।

(৬০)

তহুঁ পারাদেশীয়া হামু পারাদেশীয়া
খেলাবে আঙ্গুরি ডলায়
পারাদেশীয়া হো ভায়
তহুঁ পারাদেশীয়া হামু পারাদেশীয়া
খেলাবে মিট কী চালায়
পারাদেশীয়া হো ভায়া।

টীকা : বিবিধ গান। তুমি পারদেশী, আমি পরদেশী। আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলাবে। চোখের ইশারাতে খেলাবে।

(৬১)

পাহাড় উপর গোপনি
বাড়ি ঝুমের খেলনি
খোপয়ে বান্ধালে
ছাতানার গে সাজানি।

টীকা : বিবিধ গান। পাহাড়ের ওপরে অনেক মেয়ে আছে। তারা খুব ঝুমুর খেলছে। খোঁপায় বড় করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছে, খুব ভাল লাগছে দেখতে।

(৬২)

আজ প্রভু আঙ্গানেসে
ঘুরি গেল
নিন্দ আঁখি দাগা দেঁলে
দুওয়ারে বেসিয়ে মোছ টেওয়েরে
বাঁওয়া হাঁতে এই না দেখে
গেলেলুঁ উপার খোর ভেঁট ভেলু
নিচে খোর ভেঁট ভেলু।

টীকা : বিবিধ গান। আজ প্রভু অঙ্গনে ঘুরে গেল। দুয়ারে বসে ডান হাতে গোঁফ পাকাচ্ছে, বাম হাতে আয়না দেখছে। উপরের রাস্তায় নীচের রাস্তায় দেখা হল।

(৬৩)

সান্ধে বিহানে আওয়ে
পোহনা কাতে
মারাব মুরগী চেঙ্গা
দিল কাপাট মনে
মধু রেখিয়া
হিয়া খোলে বলে দিহাঁ।

টীকা : বিবিধ গান। সন্ধ্যা-সকালে কুটুম আসে। মাছ মাংস কাটতে হবে, রাঁধতে হবে। কপট মনে মধু রেখে হৃদয় খুলে মনের কথা বলতে বলা হচ্ছে।

(৬৪)

বরা তারে খেটিয়া
পিপারে তারে মেচিয়া
নিমাতারে রে সুতালো
নন্দুসুওয়া নিমা তারে।

টীকা : বিবিধ গান। বটগাছের নীচে খাটিয়া পাতা হল। (বাতাসের জন্য) অশ্বত্থের নীচে ছোট মাচা বাঁধা হল। সেখানেও ভাল না লাগায় নন্দসুত নিমগাছের তলায় হাওয়া খেতে গেল।

(৬৫)

দেখেঁ শায়াঁ বিপতি হামারি রে
লুগা মোর ফাটি গেল
কাটাল লুগা কাটাল শাঁয়াঁ
ম্যুড়ে নায় সিন্দুরা
আব নায় রব ঘারে
দেঁখেঁ শাঁয়া বিপতি হামারি রে
লুগা মোর ফাটি গেল।

টীকা : বিবিধ গান। স্ত্রী স্বামীকে আক্ষেপ করে বলছে, শাড়ী ও সায়া ছিঁড়ে গেছে, সে কি পড়বে এখন। মাথায় পড়ার সিঁদুরও নেই, স্বামীর কিছু দেবার মুরোদ নেই। এমন স্বামীর ঘরে সে আর থাকবে না।

(৬৬)

শাশো দেল গাড়ি
পুরুষা দেল মারি
কাতে রে সহিব গাড়ি
আবে পিয়া রাহাবনা
ঘাররে ধারাব যোগিনী ভেঁশে
ঘাটে মাঠে ভিক্ষা মাঙ্গে রে
যোগিনী ভেঁশে।

টীকা : বিবিধ গান। শাশুড়ি গাল দিল। স্বামীত্ত আমায় মারছে। গাল সহ্য করব আর কত! তোমার ঘরে আর থাকব না, যোগিনীবেশে সংসার ত্যাগ করে ঘাটে মাঠে ভিক্ষা করে বেড়াব।

(৬৭)

জড়ি জড়ি রাহাতেলুঁ
জড়ি সে বে জড়ি ভেলুঁ
বনাকে কোকিল কান্দে
জড়ি বিনু।
আপান বিনি রাহাতেলা

জাখান তাখান ধূকাতেলা
পরেক বিনি কিয়া আসা
লাগেরে বিনি বালা কেয়সা না।
জড়ি জড়ি রাহা তেলুঁ
জড়ি সে বে জড়ি ভেলুঁ
বনা কে কোকিলা কান্দে
জড়ি বিনু।

টীকা : বিবিধ গান। জোড়া জোড়া থাকতাম আমরা, এখন আলাদা হয়ে গেছি। বনের কোকিল বিচ্ছেদে কাঁদে। যখন স্বামী স্ত্রীর মিল ছিল, যখন তখন যত্ন পাওয়া যেত। এখন, অন্য কেউ এসে কি হাওয়া করে দেবে, যত্ন করবে? আগে জোড়া ছিলাম, এখন বিচ্ছিন্ন।

(৬৮)

ডোভাওয়া কেসে শুখাবে
হে রাধে ডোভাওয়া মাছেল মারে
ডোভাওয়া ঝিঁটে শুখাবে
রাধে ডোভাওয়া মাছেল মারে।

টীকা : বিবিধ গান। ছোট ডোবায় স্বামী-স্ত্রী মাছ মারতে গেছে। ডোবায় জল শুকোলে ডোবার মাছ মরবে। স্বামী-স্ত্রী তাই পাত্র দিয়ে ডোবার জল ছেঁচে শুকোচ্ছে। এভাবেই তারা মাছ ধরবে। গানটিতে সেই কথা বলা হচ্ছে।

(৬৯)

জাল জাল মিঁহিঁ জাল
সুরু সুতা মিঁহিঁ জাল
বেজি গেল গে ধেনি
ঘোঙ্গিয়ে শেঁওয়ালেত
বেজি গেল।
জাল ও হেকেল গেঁলে
বেজি গেল কাঁচা কুমারী
বেজি গেল গে ধেনি
ঘেঙ্গিয়েঁ শেঁওয়ালেত
বেজি গেল।

টীকা : বিবিধ গান। মিহি জাল, সুরু সুতোর জাল ফেলেছে, তাতে বেধে গেছে শামুক। শ্যাওলা উঠেছে তাতে। শেষে এক অল্পবয়সী কুমারী কন্যা জালে উঠে এল।

(৭০)

চেত বৈশাখে মাস
আমাকে টিকলি ঝরে

দিহা সাঙ্গাত আমা বেচে
লাল শাড়ি কিনে আন
দিয়া আমা কে টিকলে ঝরে
চেত বৈশাখ মাস
আমা কে টিকুলি ঝরে।

টীকা : বিবিধ গান। চৈত্রবৈশাখে আমের মুকুল হয়েছে। সেই আম বেচে লাল শাড়ী কিনে আন। চৈত্রবৈশাখে আমের মুকুল ভরে ঝরে পড়ছে।

(৭১)

এপারে গঙ্গা উপারে যোবনা
বিচ গাঙ্গে রে ফুটাল
কমলাক ফুল গো
বিচ গাঙ্গে ফুটাল।

টীকা : বিবিধ গান। এপারে গঙ্গা, ওপারে যমুনা। মাঝ নদীতে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে।

(৭২)

ঝেরোনিকে মেঁহুওঁয়া
বঢ়া উজার ফুলিয়া
রাত ভেল গিরো সারা রাত।
তাই সে নানাদো উলায়
ভুঞ্জাঁয় খেয়হ্যাঁ হামুঁ
খেব দেরুওয়ে চুআই
ঝরোনিকে মেহুঁওয়া
বঢ়া উজার ফুলিয়া
রাত ভেল গিরো সারারাত।

টীকা : বিবিধ গান। মহুয়াগাছ ফুলে ভরে গিয়েছে সারারাত ধরে ফুল ঝরে পড়ছে। ননদকে ফুল ভেজে দেব, আমি সুরা তৈরী করে খাব।

(৭৩)

কাতে নিন্দা নিন্দালেও দাদা
নিমা তারে রে গুমায়
নিতা তারে শুতালে হো দাদা
নিমা তারে রে গুমায়।
নিমা তারে নিন্দালে হে দাদা
নিমা তারে রে গুমায়।
বড়া তারে শুতালে হো দাদা
নিমা তারে হে ঘুমায়।

টীকা : বিবিধ গান। ভাল ঘুমের জন্য একবার নিমগাছের তলায় একবার বটগাছের নীচে শুতে যাবার কথা বলা হয়েছে।

(৭৪)

হার কাতে কান্দাব রাম
ভালুক পিয়া পার দেশে
রামে লক্ষ্মণে যেতে
অযুধ্যার বনে নাহি মিলে
কৃষ্ণণ ঠাকুর দরশনে
হার কাতে কান্দাবে রাম,
ভালুক পিয়া পার দেশে।

টীকা : বিবিধ গান। পিয়া পরদেশে। রাম-লক্ষ্মণও অযোধ্যা ছেড়ে বনবাসী হয়েছিল। কৃষ্ণ ঠাকুরেরও (কৃষ্ণও পরদেশী হয়েছিলেন) দর্শন মেলেনি। আর কত কাঁদাবে রাম, পিয়া পরদেশী।

(৭৫)

রাম মারে গুডি বাণ
তেঁতরিকে পাতে গো
রাম সুতে সিতাকে আঁচারে
রাম সুতে সিতাকে আঁচারে ভয়
রাম সুতে সিতাকে আঁচারে।

টীকা : বিবিধ গান। রাম লক্ষ্মণ রোদ জলের হাত থেকে বাঁচতে তেঁতুল গাছের গোড়ায় গিয়েছিলেন। রাম ভাবলেন, তাহলে তো আমাদের বনবাসেও কোনো দুঃখ কষ্ট নেই, তাহলে বনবাস ব্যর্থ। তখন রাম তীর ধনুক দিয়ে তেঁতুল পাতায় মারেন, তাই তেঁতুলপাতা ঝিরিঝিরি হয়ে যায়। গানটিতে রামের সেই বান মারার লৌকিক Myth প্রকাশিত।

(৭৬)

হার কাতে কান্দা মেয়াগে
রাম লক্ষ্মণ বনে চেল যায়
রাম লক্ষ্মণ বন বাস
ভরত চতুর গৃহবাস
হার কাতে কান্দাবে রাম
রাম লক্ষ্মণ বনে চেল যায়।

টীকা : বিবিধ গান। আর কত কাঁদাবে, রাম লক্ষ্মণ বনে চলে যায়। রামলক্ষ্মণ বনে বাস করেন, আর চতুর ভরত গৃহে।

(৭৭)

ছাড় দে ডাগারা যাদু
ভিজেলাম কেঁশওয়া রে

যাদু ছাড়দে ডাগারা কেশে
শুখাবেলাম কেঁশওয়া রে
যাদু ছাড় দে ডাগারা রোদে
শুখাবেলাম কেঁশওয়া রে
যাদু ছাড়দে ডাগারা

টীকা : বিবিধ গান। রাধা কৃষ্ণকে রাস্তা ছাড়তে বলছে। সদ্যস্নাতা রাধার চুল ভিজে, রাধা রোদে লম্বা চুল শুকাবে।

(৭৮)

সাত জোড় জুতুয়া গে
খিয়ায়ে গেল ধনি গো তোরে লাগি।
নারায়ণে সিঙ্গাসনে
গোকুলা বৃন্দাবনে
সাত জোড় জুতুয়া গে
খিয়ায়ে গেল ধনি গে তোরে লাগি।

টীকা : বিবিধ গান। রাধাকে খুঁজতে গিয়ে কৃষ্ণের সাতজোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল। নারায়ণ সিংহাসনে, গোকুলে, বৃন্দাবনে। সাতজোড়া জুতো সখী তোমার জন্য হারাল।

(৭৯)

ছাড়ো ছাড়ো নন্দ হরি
হামারা আঁচারিওয়া
ফাটি গিলো শাড়ি
টুন্টি যেত গুমতিহারি
আঙ্গে লাগাত ধুরি।

টীকা : বিবিধ গান। ছাড়ো নন্দ হরি আমার আঁচল, আমার শাড়ি ছিঁড়ে গেল, গলার গজমোতির মালা ছিঁড়ে গেল। গায়ে ধূলো লাগল।

ওরাওঁ গীতি

(১)

আখেরা করো বারি রামা রাসা
পেল্লায় রাসা রামরাসেরা লাগনায়
আলা রামা রাসা লাগনায়।

টীকা : কারাম গান। তুমি এমন করে মাদল বাজাচ্ছ, আমার পায়ের তাল পড়ছে না, নাচ ভুল হয়ে যাচ্ছে।

(২)

হে ছোঁরা হাতে নেইলে কারাম
ছুঁরি হাতে নেইলে
হায়রে কারাম হালা রে...
নুপাসে নেইলে কারাম তিয়াসে নেইলে
হায়রে কারাম হালা রে...

টীকা : কারাম গান। কারাম ডাল ছেলেদেরকে ভাঙার পর মেয়েদের হাতে তুলে দিতে বলা হচ্ছে।

(৩)

নে নাং বার চান ইন্নাং কা লাগি
ওন্দে খাঁদিয়ো বর্‌রে খাঁদিয়ো
নামহায় কারাম কা লাগি
হে নেনাং বার চান ইননাং কা লাগি।

টীকা : কারাম গান। আজকে কারাম এল, কালই চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি মন ভরল না।

(৪)

আজেসে নাইলে কারাম মানোয়া হাতে
চারওয়া হাতে ডোলাতে আওয়ই।
নিতেক দিনে কারাম জানে তানে রাহালে
নিতেক দিনে কারাম জানে তানে রাহালই
বীজোবানে রাহালই
কারমা হাতে ডোলাতে আলাই।

টীকা : কারাম গান। আজ মানুষের হাতে কারাম এল। এতদিন যেখানে সেখানে সে ছিল। ঝড়ের মত আজ সে দুলতে দুলতে এল। এতদিন কারাম জঙ্গলে ছিল।

(৫)

শিলিগুড়ি পারতানু তামাম খেল খারকিয়া
গুচাই দাইগো নেরা বেচা কালত
নিন্ জুনু বিচকায়
নিন্ জুনু খুটকায়
নিন্ তায় বেচামালা বারদায়।।
খেল খোটরকা ঢিবান চাঁড়ে চিয়োয় হো
নিন গা বেচামালা বারদায়।।

টীকা : কারাম গান, শিলিগুড়ি পাহাড়ে মনমাতানো মাদল বাজছে। চল দিদি খেলতে যাব। তুমি নিজে **মাদল খেললে**, তুমি নিজে ভেঙে দিলে। এখন মাদলের দাম দেবে কে?

(৬)

কারামাকে দিনে পানি না বারসায়
পানি ঝাকামাকা পানি।
পানি ঝিলিমিলি পানি।
কারমাকা দিনে পানি না বারসায়।

টীকা : কারাম গান। কারামের দিন বৃষ্টি পড়ছে না। ঝকমকে বর্ষণ, ঝিলিমিলি বর্ষণ হচ্ছে না। কারামের দিন বৃষ্টির দেখা নেই।

(৭)

জাওয়া জাগালে জাগালে
হারাদি পানিসে জাগালে
মায়ালেখা বাবুলেখা জাগালে
জাওয়া জাগালে জাগালে

টীকা : কারাম গান। জাওয়া জাগানোর সময় গাওয়া হয়। ছোট মেয়েরা, ছেলেরা হলুদ আর জল দিয়ে সবাই জাওয়া জাগাও।

(৮)

নিতান নিতান সাপরারেন এন্দিগোই্
উন্দুলবেচা পোল্লান দিগোয়
উন্দুলবেচা পোল্লান
মেতরানা কোরেগা দিগোই
মেতমালকাকোরে দিগোই
মেতমালকাকোরে।

টীকা : কারাম গান। অনেকদিন আমি কারাম খেলিনি। আজ খেলব ধুরিয়া কারাম, তাই প্রস্তুতি নিচ্ছি প্রতিদিন। অথচ একদিনও খেলতে পারছি না। এদিন ডিগামাদল বাজিয়ে নৃত্যগীত হয়, আবির খেলা হয়। গানে দুই নারী বলছে, আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও কারাম খেলতে দিচ্ছে না। স্বামী থাকা ভাল নাকি খারাপ।

(৯)

কাহাঁকেরা পান
মান্দারবাঁশি পানকাঁহা ছোরেআলে
আখেড়া কাহাঁকেরা পান
আখেড়া মাতালে মান্দারবাঁশি পান।

টীকা : কারাম গান। কোথাকার বা কোন দেশের পান। মাদল-বাঁশি-পান কোথায় ছেড়ে এলে। আখড়ায় কোথাকার পান। আসর মাতানো মাদল-বাঁশি ও পান।

(১০)

কোন ফুলা ফুলি গেলা নায়য়োগে
হায়রে হালা নায়য়োগে
দেশা গামাকায় রাজি গামাকায়
তুলসী ফুলা ফুলি গেলা নায়য়োগে
হায়রে হালা নায়য়োগেয়া
দেশা গামাকায় রাজি গামাকায়।

টীকা : কর্মাগান। কোন ফুল ফুটেছে যে তার সুবাসে দেশ পৃথিবী মুখরিত হল। তুলসীগাছ লাগানো হয়েছে। সেই তুলসী ফুল ফুটেছে, বাতাস সুগন্ধে ভরে গেছে।

(১১)

রাজিআইগি রাজিকারাম বারচান
হারে এনদান বাড়ি পেলো বাহনায়য়ো
ইব্‌রি হাটিয়া বাঢ়ায়চিকোয় বেটি
নিঙ্গায় গেরালি ঝাবান খেন্দোন নিঙ্গাগে
বানাকেচুরিন খেন্দোন।

টীকা : কারাম গান। দেশের কারাম আসছে। মা বলছে মেয়েকে তোমায় নতুন কাপড় দেব। মেয়ে উত্তরে বলছে, তুমি কোন ফুল লাগিয়েছ, দিনেও দেখছি। রাতেও দেখছি। মা বলছে, আরল ফুল।

(১২)

আইয়ো না সভা বৈসে
বাবা না সভা বৈসে

সভা বৈসে গাওয়া ভাইরা রে।
আইয়ো না আকিল দিয়ে
বাবা না বুজ দিয়ে
বুজ দিয়ে গাওয়া ভাইয়া রে।

টীকা : কারাম গান। করম পূজা হচ্ছে। অথচ বাবা-মা—গ্রামবাসী কেউ কোনো বুদ্ধি দিল না। গ্রামে এখনো সভা বসল না পূজা উপলক্ষে। গানটি বিবাহেও গাওয়া হয়।

(১৩)

হাজারো বাড়ামুলিন কিচ্‌রি
খোলের খোলের খাতরা
খাতেরা চিয়া ভায়া
খোলেরা চিয়া ভায়া
হাজারো বাড়ামুলিন কিচরি
খোলের খোলের খাতেরা।

টীকা : সহরায় গান। হাজার হাজার বটগাছের তলায় কাপড় খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে। কাপড়টা পড়তে দাও, খুলতে দাও। অসংখ্য বটবৃক্ষের নীচে কাপড় খুলে খুলে পড়ছে। পূর্বে বটবৃক্ষের বিবাহ দেওয়া হত বস্ত্র পরিধান করিয়ে, বর্তমানেও এই বহুল প্রচলিত রীতিটি লুপ্ত হয়নি। সম্ভবত সেই বস্ত্র পরিহিত বটবৃক্ষের চিত্ররূপ গানটিতে ভাষা পেয়েছে।

(১৪)

কেকারে লাল মোরগা
বোলয়ো মোরগা বিহান
রাজাস গি লাল মোরগা
বোলরে মোরগা বিহান।

টীকা : সহরায় গান। কার লাল মোরগ ভোরবেলা ডাকছে। রাজার লাল মোরগ ভোরবেলা ডাকছে।

(১৫)

গঁয়ঠা পেশা কেরকান দিগয়
গঁয়ঠা গুসান ডেরা নান্‌জান
চেঁড়িয়া জোকাস লাওচাস দিগয়
কারমা এঙ্গায় রাহাই কেড়া।

টীকা : সহরায় গান। আমি ঘুঁটে কুড়াতে গেলাম দিদি। সেখানেই আমি বাঁসা বাঁধলাম। একটি তরুণ ছেলে আমার কোমরে প্রহার করল, কোমরের ব্যথায় আমি সেখানেই থেকে গেলাম।

(১৬)

হিড়িং বাড়ায়কোই বানাকেচোরিন্ পেলো
নিংহায়বেনু রিজমালা লাগ্গি
পৈরিবেরি বানাকেচোরিন পেলো
নিংহায়বেনু রিজমালা লাগ্গি
হুরর...

টীকা : ঝাগুা গান। সমবয়স্ক বন্ধুকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। তার পাড় লাগানো শাড়ি। সেই বন্ধু না এলে আনন্দ হচ্ছে না। সকালবেলায় আহ্বান করা হচ্ছে পাড়ওয়ালা শাড়ি পরিহিত বান্ধবীকে। সে না এলে আনন্দ হচ্ছে না।

(১৭)

তানি কুনা গবারি লাগ্গিয়া
আঙ্গেগা পেল্লো রাগা রুসি মানি।
পৈরিবাড়ি গবারি লাগ্গিয়া
আঙ্গেগা পেল্লো রাগা রুসি মানি।
হুরর...

টীকা : ঝাগুা গান। অল্প একটু গোবরের ছিটা লেগে গেল। সেইজন্য সেই বন্ধু আমার ওপর রেগে চলে গেল। সকালবেলা গোবরের ছিটা লেগে যাওয়ায় বন্ধু রেগে চলে গেল।

(১৮)

কেকারো মাণ্ঠ মৈয়া
সোনাগি বিল্লি লাগেরা লাগি
বালারে হায়রে ভায়াবাগারো
কেকারো মান্ঠ মৈয়া
সোনাগি বিল্লি লাগেরা লাগি
হায়রে তাগরে, রাজাস্গি মান্ঠ মৈয়া
সোনাগি বিল্লি লাগেরা লাগি।

টীকা : ঝাগুা গান। কার মন্দিরের ওপর সোনার প্রদীপ জ্বলছে। রাজার মন্দিরের ওপর সোনার প্রদীপ জ্বলছে।

(১৯)

আরে বালা রে হায়রে আয়
ছাতা ধারু বেলাস দো
রাজি নেরাগে নুরেখা লাগ্দাস।
হায় তাগলে, মাঞ্জা ডামাডোলা।
আ রাজি নেরাগে নুরেখা লাগ্দাস্।

টীকা : ঝাণ্ডা গান। ছত্রধারী রাজা দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। যখন দেশে বিশৃঙ্খলা-গণ্ডগোল দেখা দিল, তখন রাজা দেশের প্রকৃত অবস্থা দেখার জন্য বেরোলেন।

(২০)

হে চল্‌রে দাদা দাসাই দেখে যা
চলরে দাদা দূর্গা দেখে যা
হাতে ধারালে ঢাল তরোয়াল
হাতে ধারালে তীর ধানুক
ডাঁরা ভার কেশলো রে
ডাঁরা ভার কেশ
রাহ্থে সাজালো দেবী ষোলো সিঙ্গার
দাদা ডাঁরা ভার কেশ লো রে
ডাঁরা ভার কেশ।

টীকা : দাসাই গান। চল্‌রে দাদা, দাসাই দেখে যা, দুর্গা দেখে যা। হাতে ধরেছে ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক। কোমর পর্যন্ত দেবীর ঘন চুল। রথে চড়ে দেবী এসেছেন, ষোলো সিঙ্গারে সেজে এসেছেন। দেবীর কোমর অবধি ঘন চুল।

(২১)

নাগপুর পাহাড় তানু
তামালখেল্‌ খাড়কিয়া
বাড়ায় বাড়ায় গুইয়া
গুচায় গুচায় গুইয়া
নাগপুর এড়া কালোত
বাড়ায় বাড়ায় মাইয়া
বাড়ায় বাড়ায় মায়া
ইননাগা এড়া কালৈ
ধর্‌তিনু নাংহায় দাসাই বারচা
ধর্‌তিনু নাংহায় দাসাই বারচা।

টীকা : দাসাই গান। নাগপুর পাহাড়ে মনমাতানো মাদল বাজছে। এসো এসো গুইয়া, চল চল গুইয়া, নাগপুর যাব। এস চল ছোট ছেলেমেয়েরা, আজ পৃথিবীতে আমাদের দাসাই এসেছে।

(২২)

আজ ফাগু, কাল ফাগু
তিন ডাম্বুয়া—
ভৌজি ভাতার করে তো
হামাগুয়া।

টীকা : হোলির গান। দেবর বৌদিকে রং মাখানোর আগে বলছে, তুমি যদি আবার বিয়ে কর, তাহলে আমি ঘটক হয়ে তোমাকে বিয়ে দেব।

(২৩)

মাইয়া ধূলিনুরালে সাঁড়াকে সাঁড়াক
কোঁচামে শালাই বিড়ি মাইয়া
মুখামে পান।
সামসিকে আনাযানা চাঁচল থানা
ধূলিনুরালে সাঁড়াকে সাঁড়াক।

টীকা : হোলির গান। মাইয়া, সারা রাস্তা ধুলা উড়ছে, কোঁচায় আছে শালাই ও বিড়ি, মুখে পান। সামসি থেকে চাঁচল থানায় আসা যাওয়া। রাস্তায় ধূলা উড়ছে।

(২৪)

উন্দুল বেচামালা কেরান
হায়রে এনহায় ডিণ্ডা সামায়কেরা
নের্‌রেন লাকরান এনমালা এল্‌চেন
জোঁখারির খাঁড়ায় এল্‌চেন।

টীকা : হোলির গান। যুবতী বলছে আমি একদিনও হোলি খেলতে গেলাম না, আমার যৌবন চলে যাবে। আমি সাপকে, বাঘকে কাউকে ভয় করি না, ভয় করি যুবককে।

(২৫)

এন্নেবারি গুইয়া মিন্ চালমালা নান্দিন
গাতিবেচোবারি গতানান্দিন্।
গুইয়াগোয় নিংহায়বিনু
জিহা এন্‌হায় তারফারি।
নিঙ্গান এ-রাগে গুইয়া জিয়া এন্‌হায় তারফারি
ইবিরিআবিরি গুইয়াগোয় নিঙ্গানিন্ এরা তুক্কি
এ বিরিপুত্তি গুইয়াগোয় নিঙ্গানিন্ এরা তুক্কি
সেলেম্ সেলেম্ গুইয়াগোয় জুড়ি মায়না
ইবরিআবিরি গুইয়াগোয় নিঙ্গানিন্ এরা তুক্কি
এ বিরিপুত্তি গুইয়াগোয় নিঙ্গানিন্ এরা তুক্কি।

টীকা : হোলির গান। গুইয়া বলছে, সনভাই তোমায় না দেখতে পেলে আমার ভাল লাগছে না। সর্বক্ষণ তোমারই কথা মনে পড়ছে। গুইয়া সনবোনকে বলছে যে সন্ধ্যাতেও তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে।

(২৬)

শিলিগুড়ি পারেতনু তামাল্খেল্ খার্খিয়া
গুজ্ দেয়ি গো নেরাবেচো কালত্
হায়রো, কালাহু কালোয় দিগোয় মালা হো
কালোয় দিগোয় মালা হো কালোয়।
ডারেনো গোরপৈঁতি না নোয়ে
খেলখোটোর কা ঢিবান চাঁড়ে চিয়োয় ভৈয়া
জোঁখায় পেল্লায় খুট্রিআই
নিন্জুনু খুটকিন নিন্জুনু বিচ্কিন্
এন্গা বেচামালা কেরান্
এন্গা এরামালা কেরান্।

টীকা : হোলির গান। শিলিগুড়িতে মনমাতানো মাদল বাজছে। ভাইবোন বলছে চলো আমরা খেলতে যাব, দেখতে যাব, কিন্তু সেখানে মাদল খেলতে গিয়ে ভেঙে গেল মাদল, কে এখন মাদলের দাম দেবে। দুইবোন আলোচনা করেছে—ছেলেরা তো চুপ করে আছে, তারা তো দাম দেবার কথা কিছু বলছে না।

(২৭)

আইয়ো হুকিবি গুইয়া বাবাসুকেবেদাস যাক্
ভালোবাসানি নামায় ভালোরুসানি
নিঙ্গায় সঙ্গে দেখায় মানো
নিঙ্গায় গুসানি নামায় ভালরুসানি
এঙ্গায় সঙ্গে দেখায় মানো
এঙ্গায় গুসানি নামায় ভালরসানি
কে বাহু কেবৈ মালাহু কেবৈ
ভালোবাসানি নামায় ভালরুসানি
কে বাহু কেবৈ নামহায় দেখামানো
নিঙ্গায় সঙ্গে দেখামানো
নিঙ্গায় গুসানি...

টীকা : হোলির গান। লোকে যাই বলুক না কেন, তোমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক আটুট থাকবে। মা-বাবা গালি দিচ্ছে, তবু রাস্তার এ মোড়ে, ও মোড়ে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

(২৮)

নেকা তারতি বারচায় রিমিঝিমি পেল্লো
কালচিয়া হোকি বারাচিয়া হো
জোড়ি যুটিয়া পেলোন বারাচিয়া

হালা বারাচিয়া হো কি
বারাচিয়া হো
রাচি দারদি বারচান রিমিঝিমি পেলোন
বারচিয়া হো কি বারাচিয়া হো
জোড়ি জুটিয়া পেলোন বারাচিয়া
নাগপুরকি বারেচা বারামুলিনু ডেরানান্‌জা
বারাচিয়া হো ভৈয়া বেচাচিয়া হো
জুড়িজুটিয়া পেলোন বারাচিয়া।

টীকা : হোলির গান। যে দুজন সুন্দরী মেয়ে এখানে নবাগতা, তারা কোথা থেকে এসেছে, তাদেরকে আসতে যেতে খেলতে দাও। রাঁচি থেকে যে মেয়েরা এসেছে তাদের আসতে যেতে খেলতে দাও। নাগপুরে থেকে এসে মেয়েরা বটগাছের তলায় আশ্রয় নিল।

(২৯)

মাদগি পেসা কেরান দিগোয়
ধাওলিনুডেরা নান্‌জান।
চেরিয়া যোখাস লাওচাস দিগোয়
কারমানেঙ্গায় রাইকেরান।

টীকা : হোলির গান। দুই বোন মহুয়া ফুল তুলতে গিয়েছিল (অন্যের বাগানে)। কোন ছেলে দুইবোনকে আঘাত করেছে কোমরে। তাই নিয়ে তারা আলোচনা করেছে গানের মাধ্যমে।

(৩০)

নিঙ্গান এন্‌মালা বাজকান্‌ গুইয়া
এঙ্গাননিন্‌ নিংবাজকিন্‌
খুরিনু হোলিবেচাকালোক গুইয়া
হায়রে ডিণ্ডা সামেকেরান
নেররেন লাকরান এনমালা এলচেন
জোঁখারিন খাঁরা এলচেন
উন্দুল বেচামালা কেরান
হায়রে ডিণ্ডা সামায়কেরায়।

টীকা : হোলির গান, গানটিতে গুইয়া বলছে, আমি তোমাকে বলিনি, তুমি আমাকে বললে যে হোলি খেলতে যাবে না। হোলি খেলতে যেতে না পেরে আক্ষেপ করে গুইয়া বলছে আমার কুমারী বয়সটা নষ্ট হল। আমি বাঘ, সাপ, হিংস্র জন্তুকে ভয় করি না। যুবক ছেলেদেরকে ভয় করি। একদিন ওদের ভয়ে খেলতে গেলাম না। তাই মনে হল আমার কুমারী বয়সটা যেন অতিবাহিত হল।

(৩১)

ধার্তি আয়াং ধারতি আং।
ধার্তি আয়াং ধারাম দেঁওতা।
ধারতি বাঙ্ ধারাম দেঁওতা
ধারতিনু জানাম্ ধারতি করম
ধার্তিনু মারান ধারতি ধারাম
ধার্তি আয়াং ধার্তি আং।

টীকা : সৃষ্টির গান। পৃথিবীর মা, পৃথিবীর শরীর ধারাম দেবতা। পৃথিবীর পিতা ধারাম দেবতা, পৃথিবীতে জন্ম, পৃথিবীতে কর্ম, পৃথিবীতেই মৃত্যু, পৃথিবীতে ধর্ম।

(৩২)

লুর পারিয়ানুং নামহায়
রাজিরাজা দেশরাচা
আবাক্লি লুর পারিয়ানু
লারকা মান্জকিরাহ্চা
ভাইয়াবাগারো মায়াবাগারো
বাবাবাগারো আইয়োবাগারো
আবাক্লি আলারিং খহ্তালাগ্নার
পিটা-লাগ্নার পেল্লারিন ধারালাগ্নার
আবাক্লি নামহায় ভাইবাহিন ভুংগনুং
ভুংগণুং কেরার্কি কাক্রোলাতানু
পাহারমাইয়া বাসনাঞ্জার
আসানলাতানু সেতসেত্রা
জগহারাহাচা আসানিং
ভায়াবাহিন বাসনাঞ্জায়
খ্খাণু লারকা মুঞ্জ্রাকেয়া
আবাক্লি বাহারি উরখিয়ার
কি এরালাগ্নার
রাজিনু আলারমালার এথর্নার
দোনো ভায়াবাহিন্ মিল্লের্কি
সংসার নাঞ্জার
ইয়ান্তিং নামহায় ফিরভি
আলজানাম্গি আস্তেকিং
সৃষ্টি মাঞ্জকাত
ইদিং নামহায় সৃষ্টি ইতিহাসহিকে।

টীকা : সৃষ্টির গান। আদিমযুগে বা প্রাচীনকালে আমাদের দেশ ছিল, আমাদের রাজত্ব ছিল। সেই আদিমযুগে একটা মহাযুদ্ধ হয়েছিল। হে ভাই, হে বোন, হে বাবা, হে মা, যুদ্ধে মানুষকে কাটতে লাগল, যুবতীদেরকে ধরে নিয়ে গেল। এখন কাঁকড়ার গর্তে ভাইবোন প্রবেশ করল। ওখানে স্যাঁতস্যাতে জায়গা ছিল, মনোরম ছিল না, ওখানেই ভাই-বোন মিলে সংসার শুরু করল। তারপর গুহা থেকে বেরিয়ে তারা দেখল, দেশে মানুষ নেই। দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন দুই ভাই-বোন মিলে সংসার শুরু করল। ওখান থেকে মনুষ্য-জন্ম বা আদিমসৃষ্টি হল।

(৩৩)

বাঢ়া রে হায়রে আয়
ভায়া বহিন রাহাচ্‌কাত
সিরাসিতা নালিনু রাহাচ্‌কাত
হায়রে কাঁকরোলোতা নেরেপা দো
সিরাসিতা নালিনু রাহাচ্‌কাত।

টীকা : সৃষ্টির গান। আমরা ভাই-বোন, সৃষ্টির সময় ছিলাম স্যাঁতস্যাতে নালীতে। সেখানে ছিল কাঁকড়ালতার বাস। সেই স্যাঁতস্যাতে নালীর ভিতর বাস করতাম আমরা ভাই-বোন।

(৩৪)

হায়রে হায়রে, মায়া ডিন্‌ডা পারিয়ান
পাড়োই লিখোই মায়া
লিখোই পাড়োই মায়া
জিবোনজোতি বেদ্‌দোয়
পাড়হা লিখা বঢ়ি রে সুন্দার
পাহ্‌ড়ালি পাহ্‌ড়ালি রুনুঝুনু খারেখো
ঝুমকা লাগায়ে মায়া বাজ্‌য়ো
লাগায়ে মায়া রুনুঝুনু বোলে
মায়া মোরা বাঢ়্হি রে সুন্দার।
পহ্‌ড়ালিখা পহড়ালিখা
লেখাপড়হা শিখরোই
জিবনজোতি বেদ্‌দোয়
লেখাপড়হা বঢ়ি রে সুন্দার।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার কথা বলা হচ্ছে। পড়ালেখাই জীবনে আলো আনবে, জীবনকে সুন্দর করবে। তাই লেখাপড়া শেখা উচিত।

(৩৫)

তিরাঙ্গা ঝাণ্ডি উঢ়াবেতে ভাই
তিনরাঙা ঝাণ্ডি উঢ়াবেতে ভাই

জাতিয়ারিন মেখোত্
গুতিয়ারিন খোজোত
জাতিয়ারিন বুঝাবোতে্
গুতিয়ারিন বুঝাবোত
জাতিয়ার্গি দুরাচার
গুতিয়ারগি বেভিচার
নামিং নানোত্ একাকার
জাতিয়ারগি কালাকার
নামিং নানোত্ একাকার
গুতিয়ারগি দুরাচার
নামিং নানোত্ একাকার
নামাগি নানোত্ এক আকার
তিরাঙ্গা ঝাণ্ডি উড়াওত ভাই।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। তিনরঙা পতাকা ওড়াও ভাই। জাতির এবং গোষ্ঠীর মধ্যে যে দুরাচার ব্যভিচার রয়েছে, সেগুলো সকলকে বুঝিয়ে দূর করতে হবে।

(৩৬)

তারি বোরেন আমাওনা
আম্বাচিয়া ভাইয়ারো
তারিনং পচোগো রাই
বরেণুং পচোগো রা-ই
আরখিনুং পচোগো রাই
তারি বোরেন অণ্ডেকাৎ
তিহা মালা নাঞ্জেকাৎ
হারে রাজিন বিশিকাৎ
হারে দেশান বাচিয়ার
ইন্নাগা বেলিলা মান্জেকাৎ
আঙ্গেলেং বাআনার
মানিং বাআনার
আরখিনুং তারিনুং বোরেনং
পচোগো রা-ই।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। তাড়ি, হাঁড়িয়া, মদ—এই তিনটি পানীয়ে পোকা আছে। তাই ভাইবোনেরা, তোমরা এগুলি খেয়ো না, বরং ত্যাগ কর। আমরা মদ-তাড়ি খাই, না বুঝেই খাই। এসব খেয়ে আমরা দেশকে বিক্রী করলাম। এজন্য লোকে সত্যই বলেছে যে, এগুলিতে পোকা আছে।

(৩৭)

ও হোরি হো হো বেটা
কাহে নিতারায়
আয়ো জানাম দিয়ে যায়
বাবা কারাম করে যায়
হো বেটা কাহে নিতারায়।
আয়ো জিয়াতে বেটা বাবা।
পঢ়ালি না লিখালি ভাই
বাবা জিয়াতে বেটা
লিখালি না পঢ়ালি ভাই
পাছে তো জিহা সায়ে বেটা
গুনগুনে বুজবুজে মানা পাসতায়
আরে হো বেটা কাহে নিতারায়।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। আরে বেটা, কেন গর্ব করছ। মা তোমায় জন্ম দিল, বাবা আপনার কর্ম করল। তুমি কেন গর্ব করছ। মা বেঁচে থাকতে, বাবা জীবিত থাকতে পড়ালেখা করলে না। গুনগুন করে বোধের মধ্যে আপসোস হবে। কিসের জন্য তুমি গর্ব করছ।

(৩৮)

হায়রে আরে ভারতবর্ষ কে
আদি বাসিন্দা ভেলি
কোহ্ল ভিলি ওরাওঁ মুণ্ডা
সাঁওতাল ভেলি
আইয়াং কুণ্ডেনু জানামা ভেলি
কুলনু কালাঙ্ক দেলি
দেশকে কালাঙ্ক ভেলি
পারহালি না লিখালি
জানালি না বুঝালি
হাঁড়ি দারু তারি পিলি
কুলনু কালাঙ্ক দিলি
দেশকে কালাঙ্ক ভেলি
আয়াং তিরাঙ্গা ঝাণ্ডি
আজ রাখালি নিশান ভাই
কোহি ভেলি হিন্দু
কোহি ভেলি মুসলমান
হায় রে ভায়া, কোহি ভেলি শিখ জৈন
কোহি ভেলি রে খিষ্টান

তিরাঙ্গা ঝাণ্ডি আজ
রাখালি নিশান ভাই।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। হায়রে ভারতবর্ষের আদিবাসী কোল-ভীল-ওরাওঁ-মুণ্ডা-সাঁওতাল, তোমরা দেশ ও কুলের কুলঙ্ক। কারণ পড়াশোনা শিখলে না, বুঝলে না, হাঁড়িয়া-মদ-তাড়ি খেয়ে দেশকে কলঙ্কিত করলে। তিনরঙা পাণ্ডাই (পতাকা) আমাদের প্রতীক। আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান-শিখ-জৈন-খ্রিষ্টান। কিন্তু আজ আমাদের চিহ্ন একটাই—তিনরঙা পতাকা।

(৩৯)

আলা রে আয়রে
তাগ্‌লে পাঁচ ভায়া
মারা নান্‌কে
মারাহি আম্‌কে মানা
পৈরিবারি মারা নান্‌কে
মারাহি আম্‌কে মানা।

টীকা : শিক্ষামূলক গান। কোথাও যদি মারামারি হয়, তবে পাঁচভাই মিলে মেরে আসবে। কখনো মার খেয়ে আসবে না, মেরে আসবে।

(৪০)

পোসো বারি পোসোকিন্‌ নিন
আইয়ো এঙ্গান নিন্‌নুইয়া পোলোকিন্‌
এ ওন টিপ্পা সিন্দিরি বাবা হোয়
নানার্‌ চালি নানার্‌ বালি নাজোকিন্‌
এ পোসো বারি পোসোকিন্‌
কাহে বাবা এঙ্গান নিন নুইয়া পোলোকিন্‌
এ ওন টিপ্পা সিন্দিরি বাবা হোয়
নানার্‌ চালি নানার্‌ বালি নাজোকিন্‌।

টীকা : বিয়ের গান। মেয়ে মাকে বলছে, এতদিন ধরে লালন-পালন করলে, পোষণ করলে, এখন একফোঁটা সিঁদুরের জন্য অন্যের ঘরে পাঠালে, অন্যের হাতে তুলে দিলে। তবে কেন এতদিন ধরে পোষণ করলে।

(৪১)

নুপার বাদাল পানি বারসায়
নুপার বাদাল পানি বারসায় রে
রাসা রাসা চুয়ায় রে
টিপা টিপা চুয়ায় রে
লাম্‌কা হয়তো ঘারা ছায়ায়

লাম্‌কি হয়তো ঘারা নিপাই রে
আগুয়া রে আগুয়া
হায় রে আগুয়া
নেখায় গুসান হোঅয় আগুয়া
জুরি জুরি রাহালে
আবে জুড়ি ছুটালে।

টীকা : বিয়ের গান। উপরের মেঘ জলবর্ষণ করছে। ঘরের চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে। ছেলে ঘরের ছাউনি দিচ্ছে। মেয়ে ঘর নিকোচ্ছে। ঘটক, তুমি কার কাছে (বান্ধবীকে) নিয়ে যাচ্ছ। এতদিন আমরা একসাথে যুক্ত ছিলাম, এখন সেই বন্ধন ছুটে যাচ্ছে।

(৪২)

নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে
আয়োরে বাবা রাহ্‌নালেখা লাগ্নি
গিয়ানুপুরু আয়ো রে।
নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে
আয়োরে বাবা মাল্‌লা আন্‌নে লাগ্নি
নাগপুর ভায়া রে নাগপুর ভায়া রে।

টীকা : বিয়ের গান। নাগপুরে এসে ভাই মনে হচ্ছে, বাবা-মা বেঁচে থাকতে যেমন ছিল তেমনটি আছে। নাগপুরের ভাইরে, আজ তো আর বাবা-মা নেই, বাড়িঘর তাই যেন অন্য রকম লাগছে।

(৪৩)

লামা চাঙ্গিয়া দামেদা
টেরে পাগারিয়া
সেকে লাম্‌কি দে গা লো রে
লামা চাঙ্গি আ দামেদা
টেরে পাগারিয়া
সেকে লাম্‌কি দে গালো রে।

টীকা : বিয়ের গান। লম্বা-চওড়া চেহারার সুশ্রী জামাই। বাঁকা করে পাগড়ী বেঁধেছে। লামকিকে (কন্যানাম) সেই জামাইয়ের হাতে প্রদান করা হল। গানটি সাধারণত ছেলেপক্ষ গায় বিয়ের সময়।

(৪৪)

মালাদান তা বেলাস
বেঞ্জেরা নুরেখাস
এ উজ্জে দারা রাঐ

নায়া গাঙ্গান কাট্টোই
খেওই হোলে
মোরাগাঙ্গান কাট্টোই।

টীকা : বিয়ের গান। মালদার রাজা (বর) বিয়ে করতে বেরোচ্ছে। পথে দুর্ঘটনা থেকে যদি (বর) রক্ষা পায়, তবে নতুন জীবনগঙ্গা পার হবে, তা না হলে মরাগঙ্গায় ভেসে যাবে।

(৪৫)

সামাধিন যে আওয়াই
নাদি নাদি নালা নালা
নোটো সাম্‌ধিন ডাঁরা ধারায়
বাঁহি জোড়ায়
তার কাটো তারকুন কাটো
বাবুরে ভায়া রাজা
শিরি নুপার পাগুড়ি বান্ধায়
হালা শিরি নুপার পাগুড়ি বান্ধায়
আইয়ো না আকিল দিয়ে
বাবা না বুজ্ দিয়ে
আকিল দিয়ে গামা ভাইয়া রে
বুজ দিয়ে গামা ভাইয়া রে
তাল কাটো তারকুন কাটো
কাটোরে ভায়া রাজা
শিরি নুপার পাগুড়ি বান্ধায়।

টীকা : বিয়ের গান। সম্‌ধি আসছে দূর দূরান্ত থেকে নদী নালা পেরিয়ে। কোমর ধরে কোলাকুলি করছে সম্‌ধিরা। তাল গাছ কাটো, তারকুন (তালের ফল) কাটো ভাইরাজা। মাথায় পাগড়ী বাঁধো। তোমাকে মা বোঝাবে না, বাবাও বোঝাবে না, নিজের বোধবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে।

(৪৬)

জোড়া লা কুটুম কৈসে
ছুটালা পীরিত লাগি গেলা
ভায়া রে বালা রে কে
নায়োগে গেরোয়া জোড়ায়
হাসা জোরায় বাহি জোড়ায়
জোড়ালা কুটুম কৈসে
ছুটালা পীরিত লাগি গেলা
বালা কে হামে না আইলাম

বাজাকে লোভে রে
না আইলাম ভাতেক্ লোভে রে
হামে আইলাম বালা বালা
কানিয়াকা লোভে রে।

টীকা : বিয়ের গান। আত্মীয়তার সম্পর্ক, কুটুম্ব সম্পর্ক গড়ে উঠছে, এখন আর কীভাবে তা ভাঙবে। এ সম্পর্ক ভাঙার নয়, বাহুজোড়ে, হাঁসা জোড়ে কোলাকুলি করে দুইপক্ষের মিলন হল। আমরা বাজনার লোভে বা ভাতের লোভে আসিনি, আমরা এতদূর এসেছি ভালো কন্যার জন্য। গানটি বিয়েতে সম্ধি মিলনের সময় গাওয়া হয়।

(৪৭)

নিঙ্গান পাবেরা লাক্কান
গুইয়া মালা পাবের দায়
ঘড়ো নু বারদায়
গুইয়া রাকাম লেখা
হাতিনু বারদায়
গুইয়া রাকাম বারদায়।

টীকা : বিয়ের গান। গুইয়া (দিদির দেবর), তোমাকে এত করে ডাকছি, তুমি কেন আসছ না। কিসে চড়ে তুমি আসছ গুইয়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে নাকি হাতির পিঠে চেপে তুমি আসছ।

(৪৮)

বালা ছুটালা আইয়ো নেই
হারা আইয়োনেই হারা রে
দুধে ভাতে পোসালা আইয়ো
শাগে ভাতে পোসালা আইয়ো
বালা ছুটালা আইয়ো নেই
হারা আইয়ো নেই হারা রে।

টীকা : বিয়ের গান। মাকে বলছে মেয়ে, বাবার বাড়ি ছুটে গেল। দুধভাত দিয়ে পুষলে, শাক-ভাত দিয়ে পোষণ করলে। এখন সেই বাবার বাড়ি ছুটে গেল।

(৪৯)

ভালা কাউয়া সারঙ্গি নু কান্দায়
কাউয়া মুরলী নু কান্দায়
কাউয়া গেলা দূর দেশা
আইয়ো কান্দায় গুনগুনে
বাবায় কান্দায় বুজবুজায় রে

কাউয়া গেলা দূর দেশা
আইয়ো কান্দায় বুজবুজো
বাবায় কান্দায় গুনগুনে রে।

টীকা : বিয়ের গান। ভাল কাক দূরদেশে চলে গেল। তাই সারঙ্গির সুরে, মুরলীর সুরে অন্তরে ক্রন্দনধ্বনি উথলে উঠছে। মা গুনগুন করে কাঁদছে, বাবা বোধ দিয়ে। আবার কখনো বাবা গুনগুন করে কাঁদছে, মা বোধ দিয়ে কাঁদছে।

(৫০)

এন্নেতা বঢ়া গাঁও
কোই নাহি সাভা বৈসে
হায় হায় হে দৈয়া
কেয়াওয়াকা সিন্দুর
কেয়া ভার রহি গেলা
হায় হায় হে দৈয়া
মালোওয়াকা তেলা
মালোয়ামে রহি গেলা
হায় হায় দৈয়া।

টীকা : বিয়ের গান। এত বড় গ্রাম, কিন্তু বরণ করার জন্য কেউ নেই। কেয়া বা কৌটার সিঁদুর রয়ে গেল কৌটাতেই। মালোয়ার (মালাই) তেল মালোয়াতেই রয়ে গেল। কেউ বরণ করার জন্য উপস্থিত নেই। গানটি বিয়েতে এবং কারাম ব্রতের সময় গাওয়া হয়।

(৫১)

পুরুবে পশ্চিমে নুবাজালা কারিরে বাদারিয়া
ভিজাদ হবায় গোরারে সাওয়ার
সিতাত হবায়রায়মালা ডাণ্ডিপারোই
আবে ধানি তোরে লোভাই রে
ভিজাদ হবায় সিতাত হবায় আইকারে পাইকা
ভিজাদ হবায় গোরারে সাওয়ার
ভিজাদ হবায়রায়মালা ডাণ্ডিপারোই
আবে ধানি তোরে লোভে রে।

টীকা : বিয়ের গান। পাত্র কনেকে বলছে, আমি তোমার লোভে এসেছি। পূর্বে মেঘে ডাকছে, পশ্চিমে মেঘ ডাকছে। তবুও এসেছি তোমার জন্য। বিয়ের সভায় এই গান হয়।

(৫২)

আরি হো নিরিগা রে নিরিগা
সাতটোলা নিরিগা

যায়েকে মেলা বঢ়া দুরাহো।
আরিহো, নিরিঙ্গা রে নিরিঙ্গা
সাতটোলা নিরিঙ্গা
কোনে মারালে মিরিগা।
বাঢ়ভাইয়া চন্দরসায়
মেজভাইয়া নিন্দারসায়
ছোটভাইয়া মারালে মিরিগা ও।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। শিকারী গো শিকারী, সাতটা গ্রাম ঘুরছে। অনেক দূরে যেতে হল। শিকারি গো শিকারি, কে মৃগ শিকার করল। বড় ভাই চুপচাপ, মেজ ভাই ঝিমাচ্ছে। ছোটভাই শিকার করল।

(৫৩)

নেপাল কালাকো বিধানোন্ দেরা
ডিম্বো পেলেগি ভারি মানালাগি
পৈরিবারি নেপাল কালাকো বিধানোন্‌দেরা
পৈরিবারি ডিম্বো পেলেগি ভারি মানালাগি।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। হাতে টাকাপয়সা নেই, এই কারণে স্ত্রী মুখ ডিমের মত ফুলে গেছে। কাল স্বামী যাবে নেপালে, রোজগার করে আনবার জন্য।

(৫৪)

হায় হায়রে দৈয়া নিরিয়ান কালিকাতান
পাহ্‌তালেনু রেলগাড়ি চালেরি কালিকাতান
পাহ্‌তালেনু রেলগাড়ি
সাঁড়াকমৈয়া ট্রামকালি
মেরেখানু মেরেখানু
উড়াজাহাজ উড়াড়ি
হায়রে হায়রে দৈয়া নিরিয়ান কালিকাতান।

টীকা : বিবিধ গান। কলকাতায় গিয়ে দেখলাম পাতালে কেমন করে রেলগাড়ি চলছে, সড়কপথে ট্রাম, আকাশে উড়োজাহাজ উড়েছে। দেখে এলাম কলকাতায়।

(৫৫)

মোর পিয়া গেলে পূবে বাঙ্গেলা
কাধিয়ো না চিঠিয়ো না ভেজাহি
আঁচলাহি চিরি চিরি কাগ্‌জা বানাই
শোলা কাটায়ে কাল্‌মা বানাই
এক পাটি লিখাব সুখারে সুখা

আর এক পাটি লিখাব
আপান্ওয়া দেশা সমাচার
বাবা হো এ বাবা হো
আংগ্লাহি কাটিকুটি কাল্মা বানাই
এ বুকাহি চিরি চিরি কাগজা বানাই
এক পাটি লিখাব জিনারে মর্না
আর এক পাটি লিখাব
আপানওয়া দেশা সমাচার।

টীকা : বিবিধ গান। আমার প্রিয় গেছে পূর্ববঙ্গে। বহুদিন চিঠিপত্র খোঁজখবর পাঠায়নি সে। তাই, আঁচল চিরে কাগজ বানাই, শোলা কেটে কলম। তার একপাটিতে নিজের সুখদুঃখের খবর, অন্যপাটিতে দেশের খবর জানাব। আঙ্গুল কেটে কলম প্রস্তুত করলাম, বুক চিরে কাগজ। তার একপাটিতে জীবনমৃত্যুর খবর, আরেক পাটিতে নিজ দেশের খবর লিখে পাঠাব।

(৫৬)

চাইতি মাহিনা ভইয়াগ না বড়া যো
হায় রে ওক্কা গুইয়া
গুইয়া বির্না বাগ্গা লাগি
চাইতি বাইশাক মাহিনা
বিরনা বাগ্গা লাগি
ওক্কা গুইয়া মান্নে গোরানু
নিন্ এন্দরা বেদ্দায় যুগি
এন বেদ্দা মালা বেদ্দান আনা
মালা বেদ্দান দানা
এন বেদ্দান কানিয়া কুমার
আম্বোন চিয়োন সুন্দার দুয়ার।

টীকা : বিবিধ গান। চৈত্রবৈশাখ মাসে প্রখর রৌদ্র। তুমি এসে গাছের তলায় বসো যোগী। যোগী বলছে, আমি সোনাদানা কিছুই গ্রহণ করব না, আমি নেব সুন্দরী কুমারী কন্যা। তাকে পাবার পরই আমি তোমার দরজা ছেড়ে দেব।

(৫৭)

গুচা গুচা গুইয়া ঝুমকা
এংহান বেদৈ চিয়োই
পৈরিমানা চিয়ায় গুইয়া
কালোন কালোন গুইয়া
চিয়ায় গুইয়া ঝুমকা
নিংহায় বেদৈ চিয়োই

বিজ্‌জা মানা চিয়ায় গুইয়া
ঝুম্‌কা নিংহাই বেঁদে চিয়োই।

টীকা : বিবিধ গান। চল চল গুইয়া (দিদির দেবর), আমার নুপুর হারিয়ে গেছে, তুমি খুঁজে দাও। গুইয়া বলছ, দাঁড়াও সকাল হতে দাও, কাল খুঁজে দেব তোমার ঝুমকা।

(৫৮)

ঝাড়িগা পোস্‌সা চোতোর্‌গা চোচা
গুচা ভাইয়া রে
টোটেখা মুলিনু রাওৎ
টোটেখা মুলি জোরোগা মান্‌জা
গুচা ভাইয়া রে
করোন্‌জ মুলিনু রাওৎ।

টীকা : বিবিধ গান। বোন বলছে, বৃষ্টি পড়ছে, পথ কর্দমাক্ত। চল ভাই, আমগাছের নীচে আমরা আশ্রয় নিই। ভাই বলছে, সেখানেও তো কাদা ভরে গেছে। বোন বলছে চল ভাই, আমরা তবে কুরঞ্জা গাছের তলায় আশ্রয় নিই।

(৫৯)

আইয়ো বাবা রাহেচায়
বাহান্দেরান পোষে চায়
বাহান্দেরা খান্দেরা লাগি
বাহান্দেরাগি চিচ চায়
বাসিমাণ্ডিন চিচ চায়
বাহান্দেরা খান্দেরা লাগি।

টীকা : বিবিধ গান। মা-বাবা শিশুকে ঘুম পাড়াবে। শিশুকে বাসী ভাত খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হল। শিশুকে গানটিতে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(৬০)

বালারে হায়রে একা পাবেন্‌তি
বালিচোচা বিন্ডো ভকোরান্তি
পেলোবাঢ়া লাগি।
হায় তাগলে পৈরিবারি
বালিচোচা বিণ্ডো ভকোরান্তি
পোলোবাঢ়া লাগি।
হায় তাগ্‌লে নাগপুরতি বালিচোচা,
ভাইয়া বিণ্ডো ভকোরন্তি পেলোবাঢ়া লাগি।

টীকা : বিবিধ গান। কোনদিক থেকে দরজা খুলছে। বান্ধবী ঘরের দরজা খুলছে। বান্ধবী ঘরের দরজা খুলল কোন দিক থেকে। ভোর বেলা দরজা খুলল। নাগপুর থেকে দরজা খুলল।

(৬১)

শিম্বালি যে পুইন্দা মাঝারে গে
ঘারে ঘারে হারে ডিপ্পা নাল
আঙ্গান মাঝে রে গে ঘারে ঘারে হারে ভিঠালাল
তেঙ্গায় কুদোয়হোলে নিন
রোহোর দাগা রাজি চালান কাওই
আঙ্গান মাঝারে গে দাগা দেশা চালান কাওই
তেঙ্গায় কুদোয়হোলে নিন
রোহোর দাগা রাজি চালান কাওই।

টীকা : বিবিধ গান। স্বামী দেশে দেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে। সে শহরে যাচ্ছে। এদিকে মাঘ মাস, চারপাশে শিমূলফুল ফুটেছে। স্বামী স্ত্রীকে তার উপার্জনের কথা গোপন রাখাতে বলছে, নতুবা তাকে অন্যত্র চালান করে দেবে বলে শাসিয়েছে।

মাহালি গীতি

(১)

আষাঢ় ঢাকা ধেমধেমা
ভাদ্‌রাকা রোদে গো
সেহো রোদে গো বাবা
জাওয়া মরি গেল্‌
রাত্রি বারোটে রাত্রে
পানি বাবা জিমকাল গেল্‌
তাইও হামে গো বাবা
জাওয়া জাগাই।

টীকা : কারাম গান। আষাঢ় মাস মেঘে ঢাকা, ভাদ্রমাসে রোদ। সেই রোদে জাওয়া [রোপিত শস্যডালা] মরে গেল। রাত বারোটার সময় মেঘবৃষ্টি উপেক্ষা করে আমি জাওয়া জাগাচ্ছি।

(২)

কাঁশি ফুলো ফুটি গেল্‌
আশা মোরা লাগি গেল্‌
আরে ভেইয়া আতো নেহিয়োর
কাঁশি ফুলো উড়ি গেলো
আশা মোরা টুটি গেল্‌
আবে ভেইয়া নেহি আতো নেহিয়োর।

টীকা : কারাম গান। কাশফুল ফুটে গেল, আমার মনেও আশা জাগল। এবার ভাই বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে। কাশফুল উড়ে গেলে মনের আশাও ভেঙে যাবে, তখন ভাই আর বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে না।

(৩)

ভায়া ঘারে গেলে হুদে লাওরে
পাওয়ালোমা দানা ফেরা মুটরে
সে হরি দানা হেরা রাঙে রাঙি রে
লাগি গেলো চান্দানাকা গাছরে

চান্দানাকা গাছা
কাটি মাটি আবে নাবরে
সেহো মাটি জাওয়া জাগাই রে
পালা রিতি রিয়া হাম বা মাইও বাহিন রে
আওয়ে সুর পরিবাসরে।

টীকা : কারাম গান। ভাইয়ের ঘরে শস্যদানা দিয়ে জাওয়া জাগাচ্ছি। সেই জাওয়া চন্দন গাছের মত বাড়বে। ডালায় মাটি ভরে নিয়মরীতি মেনে আমরা মেয়ে-বোনেরা জাওয়া জাগাচ্ছি।

(৪)

উঠো-উঠো জন্‌ডরা
জনডরা বা টারে গো
হামার ভেইয়া বৈঠা তো
ফুলকা ডালে গো
চাম্পা না ঘার ছাড়ি
দেখে বা হেলা গো
আম ভেইয়া আতো
নেহিয়োর গো ধোতি।

টীকা : কারাম গান। ভুট্টা, তুমি ওঠো, আমার ভাই ফুলের ডালে বসে আছে। ভাই আসবে বোনকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে, ভাইকে দেব নতুন ধুতি।

(৫)

এঠো জেঠো বানধালাম
পিঠা লাঠা ডালরে
মাথায় বাধে রিলায় মালাই পাকরে
সেই দিনে ফালা মালা
কিশোর লাল ভেইয়ারে
লাগি গেল কারামাকা গাছ রে।
কারামাকা গাছ কাটি
মাচি আভে নাও রে
সেহো মাটি জাওয়া জাগাই রে।

টীকা : কারাম গান। করমার ডালে এত পিঠা তৈরী করে বাঁধলাম, মাথায় বাঁধলাম কারুকার্যময় বিনুনী, সেইদিন, কিশোরলাল ভাই, করমের গাছ লেগে গেল। করমের গাছ কেটে মাচা তৈরী হল, সেখানেই জাওয়া জাগানো হল।

(৬)

জনডরা ভুন্‌জারালো ডালা কেশো
মান কেহো নাই
কে নাই ভেইয়া কেশো
মান কেহো নাই
কুরথি ভুনজারালা ডালা কেশো
মান কেহো নাই।

টীকা : কারাম গান। ভুট্টা বীজ রোপন করে ডালা তৈরী করলাম, কিন্তু আমার ভাই নেই, কুর্তিকলাই রোপন করলাম ডালায়, কিন্তু আমার কেউ নেই।

(৭)

ছোটে ছোটে গাওবালি
মাঝি কুলহি আখড়া হে
ছোটে মোটে ধারতি মাইয়ো
খেলে জুওয়াসা।

টীকা : কারাম গান। ছোট ছোট গ্রামের মাঝরাস্তায় আখড়া করে কারাম ব্রত হচ্ছে। ছোট এই পৃথিবী মায়ের বুকেই কারাম ব্রত, তাকে ঘিরে কত আশা খেলা করছে।

(৮)

কারলা ফুল ফুটি গেল্
ফুটে আধা রাতি য়া
হামার দেশে যাইবে সে নানাজের
ফুলে লালে লাল।
ঝিঙ্গা ফুল ফুটি গেল্
ফুটে আধা রাতি য়া
হামার দেশে যাইবেগে নানাজের
ফুলে লালে লাল।

টীকা : কারাম গান। করলা ফুল ফুটে গেল অর্ধরাতে। আমার দেশে গেলে বিচিত্র রকমের লাল লাল ফুল দেখতে পাবে। ঝিঙে ফুলও অর্ধরাতে ফুটেছে। আমার দেশে নানারকম লাল ফুল দেখতে পাবে।

(৯)

আজ রে কারাম গোসাই
ঘারে দুয়ারে রে

কাল রে কারাম গোসাই
সাত নদীর পার।

টীকা : কারাম গান। আজ করম গোঁসাই ঘরের দরজায় এসেছে, আগামীকাল তো সে সাতনদীর পারে চলে যাবে।

(১০)

নাওয়া নাওয়া সুপ ডালি
নাওয়া পার রাতি
বারি দিহা গো মাই
রেশমের বাতি
আজরে করমেরও রাতি।

টীকা : কারাম গান। আজ করমের রাত। অঙ্কুরিত শস্যের ডালি সাজানো। রেশমের সলতে দেওয়া প্রদীপ জ্বলছে। আজ করমের রাত।

(১১)

অসুরকে ত্রিশূল মারে
রক্ত বহে যায়
তাকে বাঘে সাপে খায়
সরস্বতী মাই এই আসরে
হামে যে একাই।

টীকা : কারাম গান। অসুরকে ত্রিশূল মারা হয়েছে, রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তাকে বাঘ, সাপ খাচ্ছে। মা সরস্বতী, এই আসরে আমি একা। করমপূজার রাত ছাড়াও বিবাহ আসরে গাওয়া হয় গানটি।

(১২)

আমি এলে সবারে খুশি
ঝুমুর লাগিবে লটাই
জ্যোৎস্না আধারো রাতি
ঝুমুরও খেলিবো আমরা আজো
সারা রাতি
আমি এলে সবারে খুশি
ঝুমুর লাগিবে লটাই।

টীকা : কারাম গান। আমি এলে সবার আনন্দ, ঝুমুর নাচগান হবে জোৎস্নাভরা রাতে। আজ সারারাত আমরা ঝুমুর খেলব। গানটি কারামপুজার রাতে এবং বিবাহ বাসরে গাওয়া হয়।

(১৩)

আজ রে করম গোঁসাই ঘারে দুয়ারে রে
কাল রে করম গোঁসাই সাত নদী পার
যারে যারে করম গোঁসাই সাত নদী পার রে
ঘুরি ভাদর মাসে আনাব ঘোড়ায়ে।

টীকা : কারাম গান। আজ করম গোঁসাই ঘরে-দুয়ারে আছে। কাল সে সাত নদীর পাড়ে চলে যাবে। যাও করম, সাতনদীর পার চলে যাও। সামনের ভাদ্র মাসে তোমায় আবার আনব ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে।

(১৪)

হেনো উদয়ভালা রামে বলে
বহুত মিলল ভাইরে
দিয়ো সমধিন বেসে ঝামঝরি
ভগবান মিলাইলো জোড়ি।

টীকা : বিয়ের গান। দুই সম্ধিকে পাশাপাশি বসতে দেখে মনে হচ্ছে, ভগবান ভালো জোড়া মিলিয়েছেন।

(১৫)

নদীর ধারে হেলার গাছ
বসে পক্ষী উড়ে রে
কোন জমিদারের বেটা
বসে পাশা খেলে রে
আয়না কাঠের বায়না কাঠের
পবন কাঠের দাগারে
মিহি করে বুনাইলে চাদরো রে
সেই চাদর যাবে
দুলহা বাবুর গায়ে রে
দুলহা বাবুর মাথায়
সোনারও মুকুটও রে।

টীকা : বিয়ের গান। নদীর ধারে হেলা গাছে বসে থাকা পাখি উড়ে গেল। কোন জমিদারের ছেলে পাশা খেলছে। আয়না-বায়না ও পবন কাঠের দাগা(?) হল। মিহি বুননের চাদর ও সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে সেই দুল্হা বর আসবে বিয়ে করতে। গায়ে হলুদের সময় গানটি গাওয়া হয়।

(১৬)

বাবু-বাবুকে মুহে লাভয়েই তেল
লাওয়েতে চান্দানাকা ডাল
হো সেহো বেটা
বাইঠো উবাটা ঠাকুরা পুতা
বাইটো উবাটা।

টীকা : বিয়ের গান। বাবুকে মুখে তেল মাখানো হবে। চন্দনের ডাল আনো। ঠাকুরের পুত্র বসো, তোমায় তেল মাখানো হবে। গানটি বিবাহে 'গায়ে হলুদে'র সময় গীত হয়।

(১৭)

বাবা, বাবাকে পুছালাম
বাবা নাহি শুনাইলো রে
পণ টাকার লোভে বিহা দেল্
দেশে ছাড়াওয়ালাই রে।
মাইয়ো, মাইয়োকে পুছালাম
মাইয়ো নাহি শুনাইলো রে
মাই শাড়িক লোভে বিহা দেল্
দেশে ছাড়াওয়ালাই রে।
দাদা দাদাকে পুছালাম
দাদা নাহি শুনাইলোরে
শারা ধোতিক লোভে বিহা দেল
দেশে ছাড়াওয়ালাই রে
ভৌজি, ভৌজিকে পুছালাম
ভৌজি নাহি শুনাইলো রে
লকদিন শাড়িক লোভে বিহা দেল
দেশে ছাড়াওয়ালাই রে।

টীকা : বিয়ের গান। বাবা, মা, দাদা, বৌদি সকলকে অনুরোধ করলাম। কেউ শুনল না। বাবা কন্যা পণের লোভে, মা 'মায়ে-শাড়ি'র লোভে, দাদা শারা-ধুতির লোভে এবং বৌদি 'লক্‌দিন শাড়ি'র লোভে আমায় বিয়ে দিয়ে দিল। দেশছাড়া করল আমায়।

(১৮)

খুদি গুড়া বাবা
হে পুশি বাড়াই লে
বছরোনা কুলে বাবা

হে বিটি লাড়াই লে
হাসি হাসি বাবা
হে টাকাওয়া গানাইলে
কান্দি কান্দি বাবা
হে বেটি সে পারাই লে।

টীকা : বিয়ের গান। খুদ গুঁড়ো করে কত দুঃখ-কষ্টে মা-বাবা বড় করে তুলল মেয়েকে, কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে সেই মেয়ে পর হয়ে যায়। হেসে হেসে বাবা কন্যাপণের টাকা গুনছে, কাঁদতে কাঁদতে মেয়েকে তুলে দিচ্ছে পরের হাতে।

(১৯)

আহারো শুকিয়া গেল
পুখরো শুকিয়া গেল
আবে বেটা নেহি হতো সাদী
আহারো উবিয়া গেল্
পোখরও উবিয়া গেল্
আবে বেটা হতো সাদীয়া।

টীকা : বিয়ের গান। খাবার (জমির ধান) শুকিয়ে গেল। পুকুর শুকালো খরায়। এমন দুঃসময়ে ছেলে তোমার বিয়ে দিতে পারব না। আবার খাবার (শস্য) হল, পুকুর ভরে গেল, এবার ছেলে তোমার বিয়ে দেবো।

(২০)

শিমূল ফুলে মন মজিলো
জাতি কুলো গেলো রে
শিমূল ফুলটি দেখতে ভালো
কোনো কাজে লাগে না।

টীকা : বিয়ের গান। শিমূল ফুলে মন মজে গেলে, জাতি কুল সব গেল, শিমূল ফুল দেখতে সুন্দর, কিন্তু কোনো কাজে লাগে না।

(২১)

গৌরী পখরের ফুলি মাছ
গোলাপ গায়ের তেল রে
ছনমন ছনমন রাধে সমধিন
বেহাই মাঙে ঝোল।

টীকা : বিয়ের গান। গৌরী পুকুরের ফুলি মাছ আর গোলাপ গাঁয়ের তেল দিয়ে সম্‌ধিন চমৎকার রান্না করছে। বেহাই বেশী করে ঝোল চাইছে।

(২২)

ইন্দিরা পাহাড়মে হে
কে মারে সিটি
দাতন কাটে ঝাম ঝাম
পিয়া মারে সিটি।

টীকা : বিয়ের গান। ইন্দিরা পাহাড়ে কে শিস্‌ধ্বনি দিচ্ছে। ঝমাঝম করে দাতন কাটা হচ্ছে। পিয়া শিসধ্বনি বাজাচ্ছে।

(২৩)

ও ঢোলিয়া বাজাও জোর
ও ঢোলিয়া লাগাও জোর
খেতে দিব কালো খাসির ঝোল্।

টীকা : বিয়ের গান। ঢোলককে জোরে জোরে ঢোল বাজাতে বলা হচ্ছে। জোরে ঢোল বাজালে সে সুস্বাদু কালোখাসি অর্থাৎ শুকরের মাংসের ঝোল পাবে।

(২৪)

বাবলা গাছে ফুল ফুটেছে
রিমি ঝিমি পাতা
বিনা দোষে দোষী করো না
বড়লোকের বেটা।

টীকা : বিয়ের গান। বাবলা গাছে ফুল ফুটেছে। পাতা ভরা গাছ। বড়লোকের ছেলে তুমি। বিনাদোষে আমায় দোষী করো না।

(২৫)

হাটে গেলাম বাজার গেলাম হে
কুড়ে পেলাম বস্তা
বরপক্ষের ছেলে মেয়ে
চুনের মত সস্তা।

টীকা : বিয়ের গান। হাটে গিয়ে বাজারে গিয়ে বস্তা কুড়িয়ে পেলাম, বরপক্ষের ছেলেমেয়েরা চুনের মতই সস্তা। অর্থাৎ বরপক্ষের ছেলেমেয়েরা কন্যাপক্ষের ছেলেমেয়ের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তার মতই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক।

(২৬)

মাছ মারতে গিয়েছিলাম
রমানাথের বিল
মাথায় আছে মাছের ডালি

উপরে উড়ে চিল
দাদা গুলাপটি দেনা লো
মারে দিবো সোনা বরণ চিল।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। রমানাথের বিল থেকে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, মাথায় আমার মাছের ডালা, তার লোভে চিল উড়ছে। দাদা, তুমি তীর দাও তো, সোনালী চিলকে মারবো।

(২৭)

দশ পয়সার মাছ নিয়ে
পিড়াৎ বসে বাছে
বড়কি দিকে পিঠ করে
ছুটকি দিকে হাঁসে
বন্ধুওয়ালো কে দিয়েছে
রঙ ফুলের মালা।

টীকা : কর্মসঙ্গীত। দশপয়সার মাছ নিয়ে পিঁড়িতে বসে বাছছে, বড়দিদির দিকে পিছন মুখ করে ছোটবোনের দিকে চেয়ে হাসছে। বন্ধু, তোমায় রঙীন ফুলের মালা কে দিয়েছে।

(২৮)

টিকলি উপর টিকলি হে
নাই লিবো টিকলি
ভাতার গেলো নিকলি
নাই লিবো টিকলি।
সাইকেল উপর সাইকেল হে
নাই লিবো সাইকেল
ভাতার গেলো রামকেল
নাই লিবো সাইকেল।

টীকা : বিবিধ গান। কপালে আমার টিপের ওপর টিপ, আর টিপ নেব না। আমার স্বামী চলে গেছে। সাইকেলের ওপরে সাইকেল, আর সাইকেল নেব না, আমার স্বামী রামকেলিতে চলে গেছে।

(২৯)

যদি আশাই থাকো রে বন্ধু
ফিরাবে নয়ন
যদি আশাই থাকো রে বন্ধু
তুমি তো রাজারি কন্যা
আমি গরু রাখাল

টাকা চাই না পয়সা চাই না
প্রেমেরই কাঙ্গাল বন্ধু
যদি আশাই থাকোরে বন্ধু।

টীকা : বিবিধ গান। যদি আশায় থাকো বন্ধু, চোখে ফেরাবে। তুমি তো রাজার কন্যা, আমি গরু চড়ানো রাখাল। টাকাপয়সা চাই না, শুধু প্রেমের কাঙাল।

(৩০)

বাবা কান্দে ভালা হাটে ঘাটে
মাইও কান্দে ভালা পুখর ঘাটে
দেওরা কান্দে মন্দিরও ভিতরে গো
স্বামী কান্দে আচলও ধরিয়া

টীকা : বিবিধ গান। বাবা কাঁদে হাটে ঘাটে, মা কাঁদে পুকুরঘাটে, দেওর কাঁদে মন্দিরের ভিতর, স্বামী কাঁদে আঁচল ধরে।

(৩১)

কোন্ বনে ডাকিলো কোকিল
হিথায় লাগিলো মায়ারে
কোন্ বনে ডাকিলো কোকিল
উঁচু ডালে বসিয়া কোকিল
কেন কান্দাও মনো রে
আমায় কেন কান্দাও মনো রে
কোন বনে ডাকিলো কোকিল।

টীকা : বিবিধ গান। কোন বনে কোকিল ডাকল, এখানে মায়া জাগল। গাছের উঁচু ডালে বসে কোকিল ডেকে কেন আমার মনের মাঝে বেদনার অশ্রু জাগাচ্ছে।

(৩২)

পোখরো খড়িলাম বন্ধু
না বাধিলাম ঘাট রে
ডালিমো লাগাইয়ে বন্ধু
গেলেন পরদেশী রে
পাকিলো ফুটিলো ডালিম
লোকে তুলি খাই রে।
এদেশে পণ্ডিত নাই
কেয়াকে বুঝাই রে।

টীকা : বিবিধ গান। পুকুর খনন করলাম বন্ধু, কিন্তু ঘাট বাঁধালাম না। ডালিমগাছ লাগিয়ে বন্ধু

তুমি ভিন্‌দেশে গেলে। সেই গাছে ডালিমফল পাকলো, ফুল ফুটলো, অন্যলোকে তা খেল। এখানে তো পণ্ডিত নেই, কাকে বোঝাবো।

(৩৩)

বাঁশি আর না বাজায়ও দুপুরবেলা
চিকন কালা
বাঁশি রে তোর পিতল বাঁধা
বাঁশি বাজে রাধা রাধা
বাঁশি সুরে মন মুজালো
সকল রইলো আশা হে
চিকন কালা
আমি যখন রানতে বসি
বন্ধু তখন বাজাও বাঁশি
বাঁশির সুরে মন মজালে
সকল রইলো আশা হে চিকন
বাঁশি আর না বাজাইও দুপুরবেলা
চিকন কালা।

টীকা : বিবিধ গান। বাঁশি বাজিয়ো না দুপুরে। চিকন কালা, তোমার পিতল বাঁধানো বাঁশির 'রাধা' সুরে মন মজেছে। যখন আমি রাঁধতে বসি, তখন তুমি বাঁশি বাজাও। বাঁশির সুরে মন মজালে, আশা জাগালে। চিকন কালা, আর বাঁশি বাজিও না দুপুরে।

(৩৪)

তহে হেকো ভালা বড় দিদি
হামে হেকো ভালা ছোট দিদি
ভালা দিদি ভাই
তহর সঙ্গে লাগম কিনা লাই।

টীকা : বিবিধ গান। তুমি আমার বড়দিদি। আমি হলাম তোমার ছোট ভাই। আমি কি তোমার সামনে স্পর্ধা দেখাতে পারি!

(৩৫)

মালদা বাজার পাকি সড়কমে
দৌড়াইছে মোটর হে
শুনো হে ডাইবর রোকে হো মোটর
হামে যাবো নেহিয়োর।

টীকা : বিবিধ গান। মালদা বাজারের পাকা রাস্তায় মোটরগাড়ি দৌড়াচ্ছে, শোনো ড্রাইভার, তুমি গাড়ি থামাও, আমি যাব বাপের বাড়ি।

(৩৬)

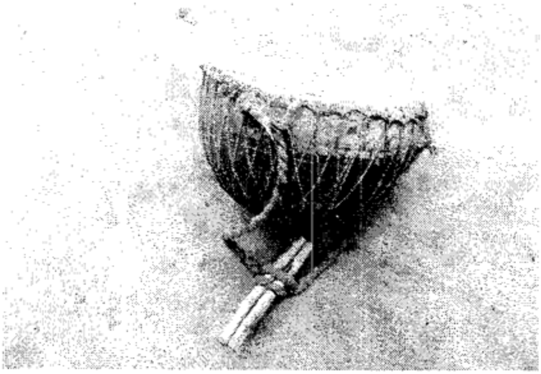
সুনসুনি শাক তুলতে গেলাম
পিছলে পড়লাম হাইরোটে
দেখলি দেওর তুললি না
তোর ভাইয়ের ভাত খাবো না।

টীকা : বিবিধ গান। সুনসুনি শাক তুলতে গিয়ে হাইরোডে পিছলে পড়লাম দেখেও দেবর তুলল না। দেবর, তোমার ভাইয়ের ভাত আমি আর খাব না।

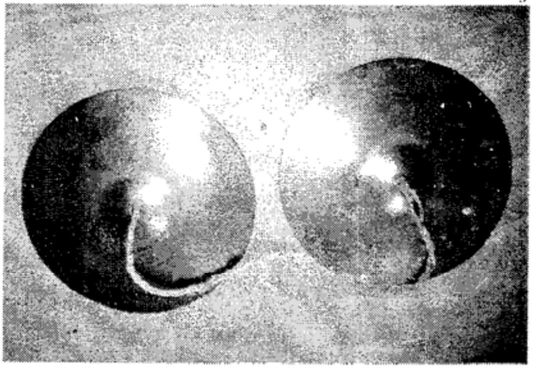
আলোকচিত্র



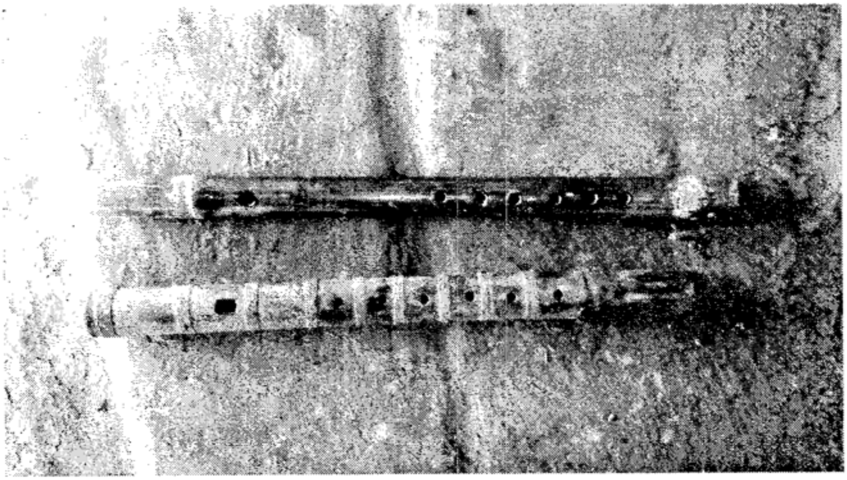
মাদল



ধামসা/ডাম্বুয়া/ডিগা



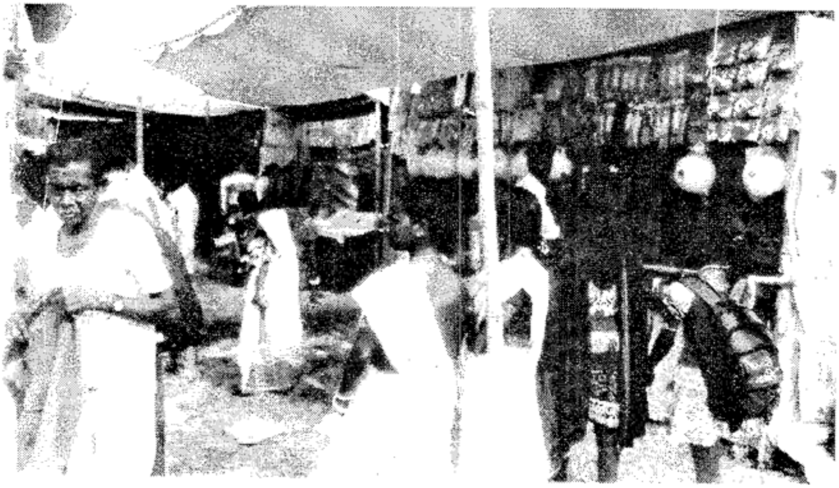
ঝাঁঝ



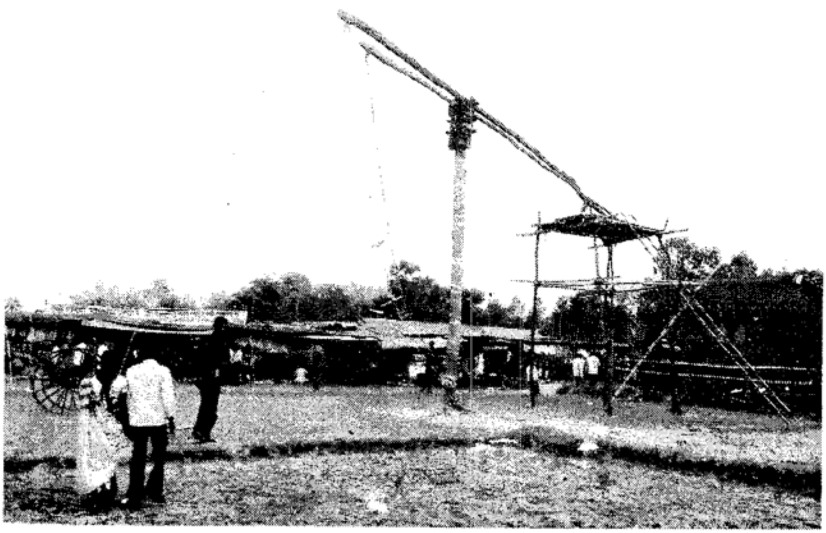
বংশী ও তিরিয়ো



অনুষ্ঠানে বাদ্যবাদনরত আদিবাসী



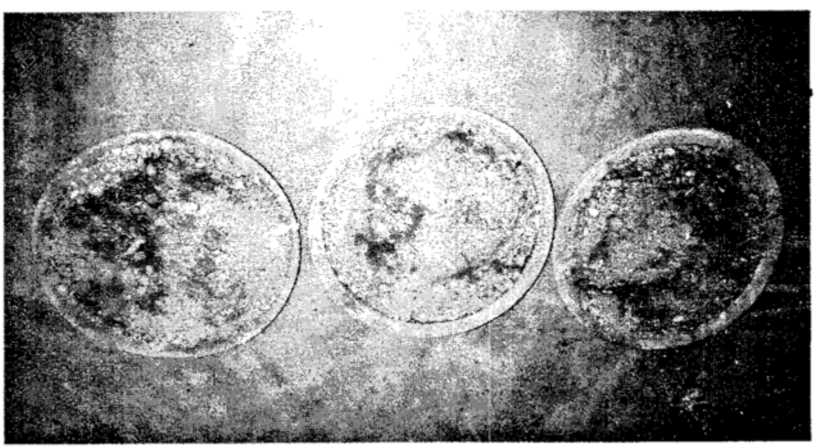
সজনামেলা—আদিবাসী চড়কমেলা



আদিবাসী চড়কের ঘূর্ণনদণ্ড



চড়কপূজায় 'মুখা' পরিহিত ভরণপ্রাপ্ত ভক্তা



কারামব্রতে 'জাওয়া' জাগানোর ডালা

165



ওরাওঁ সম্প্রদায়ের কারাম নৃত্যগীত



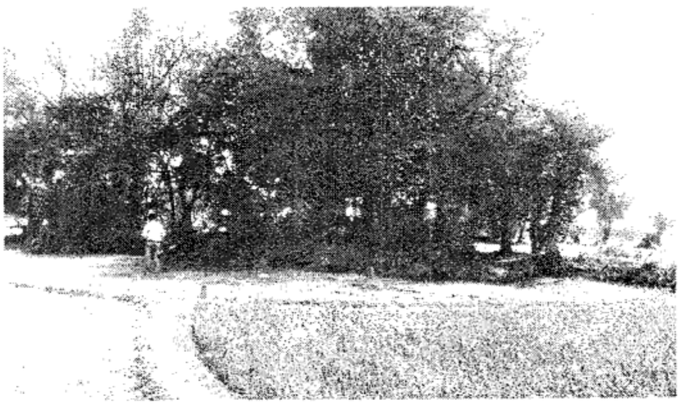
কোরা সম্প্রদায়ের কারাম নৃত্যগীতানুষ্ঠান



ডায়ের পূজার ডালা নিয়ে
'পারবেতি' বোনেরা (কোরা)



জাহেরথানে গমনরত নায়কি ও নায়কি-পত্নী—পিছনে নৃত্যরত সাঁওতাল রমণী



প্রশস্ত উর্বরাভূমির মাঝে বৃক্ষ পরিবৃত জাহেরথান



জাহেরথানে বাহানৃত্য ও সঙ্গীত

167



সাঁওতালদের দাসাই নৃত্য ও সঙ্গীত



বাঁধনা পরবে গরু পূজার পরে নৃত্য



সহরায় নৃত্য



ওরাওঁ বিবাহে নাগপুর যাত্রার অভিনয়



ওরাওঁ বিবাহে গোত্রমিলন—সিঁদুর, তেল ও পচানিযোগে



ওরাওঁ বিবাহে সমধিমিলন



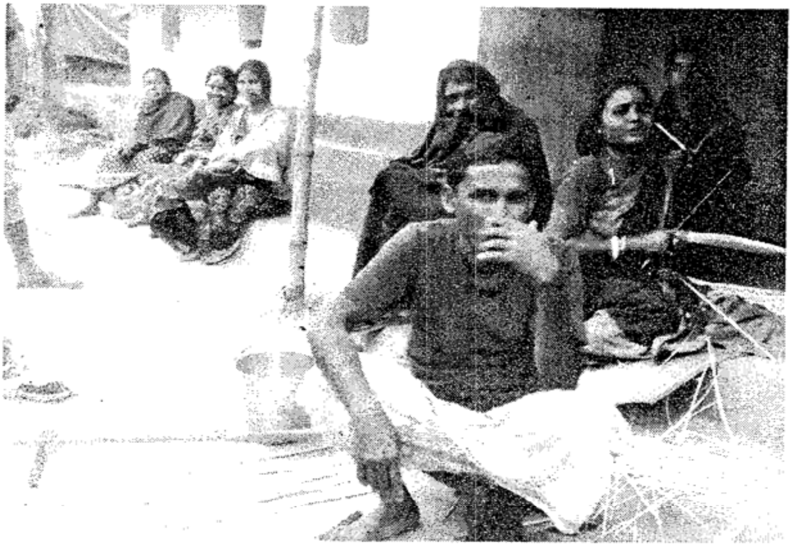
ওরাওঁ কন্যার
পতিগৃহযাত্রা—বিবাহের
মাসাধিককাল পরে



বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুতরত
মাহালি পুরুষ



বাঁশের দ্রব্য প্রস্তুতরত
মাহালি নারী



একটি মাহালি পরিবার



একটি ওরাওঁ পরিবার

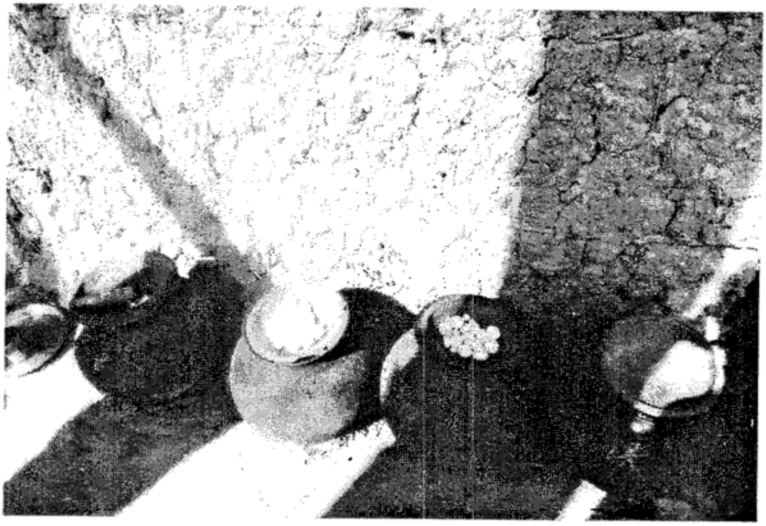
171



গ্রামীণ আড্ডায় কোরা নর-নারী

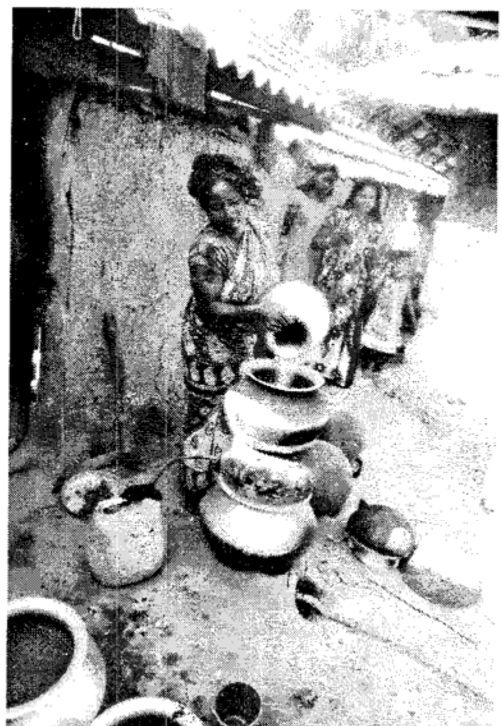


প্রবীণ সাঁওতাল গায়ক চূড়কা হাঁসদা



হাঁড়িয়া প্রস্তুতের মুখ্য উপকরণ

হাঁড়িয়া প্রস্তুতরত
আদিবাসী রমণী





একটি সাঁওতাল গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষণ কার্যরত লেখিকা



একটি মাহালি গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষণ কার্যরত লেখিকা

গ্রন্থপঞ্জি

১. ঘোষ, দীপঙ্কর ২০০৯, আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

২. ঘোষ, প্রদ্যোত ২০০৭, বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৩. ঘোষ, সুবোধ ২০০০, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৪. চৌধুরী, অরুণ ২০১৩, আদিবাসী জীবন : সমাজ ও সংগ্রাম, গাংচিল, কলকাতা।

৫. টুডু, রেস্কা, রামদাস ২০০৭, খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৬. দাস, অমলকুমার ও শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৬, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোকসাহিত্য (বিশেষ সংখ্যা ১৮), পশ্চিমবঙ্গ সরকার তফসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ, কলকাতা।

৭. নাথ, প্রমোদ ২০০৮, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী জনজীবনে পূজাপার্বণ, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা।

৮. নাথ, প্রমোদ ২০০৫, প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান ২০১২,প্রসঙ্গ আদিবাসী, অফবিট পাবলিশিং কলকাতা।

১০. বড়ুয়া, বিপ্রদাস (সম্পাদিত) ২০০৮, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

১১. বসু, নির্মলকুমার ১৩৫৮ হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

১২. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ ১৯৮৭, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

১৩. বিশ্বাস, রতন (সম্পাদিত) ২০০১, উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা।

১৪. ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু (সম্পাদিত) ১৯৭৭, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

১৫. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি ১৯৯৮, লোককথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

১৬. মল্লিক, ঋত্বিক (ভাষান্তর ও সম্পাদনা) ২০১২, ভেরিয়ার এলুইন-এর আদিবাসী, সেতু, কলকাতা।

১৭. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ ২০১২, জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা।

১৮. মাহাতো, পশুপতিপ্রসাদ ২০১২, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা।

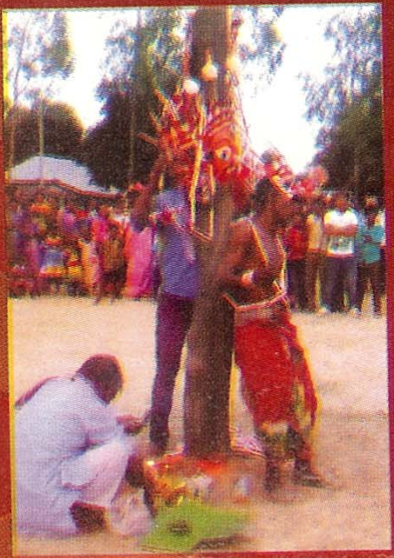
১৯. সাহা, চন্দনা ২০১৪, লোকসংস্কৃতি ও সংস্কৃতির দর্পণে বাংলার মুখ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

175

২০. সুর, অতুল ২০১১, প্রাগৈতিহাসিক ভারত, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
২১. সুর অতুল ২০১২, বাঙলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
২২. সুর, অতুল ১৪১৯, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ, কলকাতা।
২৩. সুর, অতুল ২০১২, হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
২৪. Bose, Nirmal Kumar 1953, Cultural Anthropology and other Essays, Indian Associated Publishing Co. Ltd. Calcutta.
২৫. Bose, Nirmal Kumar 2002, Tribal life in India, National Book Trust, New Delhi.
২৬. Bhattacharya, Asutosh, 1977, The Sun and The Serpent Lore of Bengal, Firma KLM, Calcutta.
২৭. Frazer, James George 1958, The Golden Bough : a stady in Magic and religion, Macmillan, New York.
২৮. Leve'-strauss, Claude 1978, Myth and Meaning, Rout ledge & Kegan Paul, London and Henled.
২৯. Lewis I.M. 1986, Religion in Context : Cults and Charisma, Cambridge University Press.
৩০. Malinowski, Bronis law 1926, Crime and Custom in savage society, Rout Ledge & Kegan Paul Ltd. London.
৩১. Malinawski Bronis-law, 1974, Magic, Science and Religion and Other Essays, Savenir Press, London.
৩২. Rice, Stanley 1937, Hindu Customs and Their Origins, George Allen & Unwin, London.
৩৩. Risley, Herbert 1891, Ethnographic glossary, Bengal Secretarial Press, Calcutta.
৩৪. Roy, Sarat Chandra 1972, Oraon Religion & Customs, Editions Indian, Calcutta.
৩৫. Sarkar, Benoy Kumar 1972, The Folk-element in Hindu Culture, Oriental Books, New Delhi.

ক্ষেত্রসমীক্ষণ সহায়ক

১. চুরকা হাঁসদা, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
২. সোম হাঁসদা, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
৩. জোসেফ হাঁসদা, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
৪. ডমিনিক মার্ডি, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
৫. সুপ্রিয়া মুর্মু, ইংরেজ বাজার ব্লক, মালদা।
৬. বিজয় মুর্মু, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
৭. শ্রীমন্ত ওরাওঁ, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
৮. জ্যোতিষ ওরাওঁ, ইংরেজবাজার ব্লক, মালদা।
৯. মালুয়া ওরাওঁ, ইংরেজবাজার ব্লক, মালদা।
১০. সুনীল এক্কা, চাঁচল ব্লক, মালদা।
১১. সোধীন্দ্রনাথ টোপ্পো, রতুয়া-১ ব্লক, মালদা।
১২. রবীন্দ্রনাথ টোপ্পো, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা।
১৩. কৃষ্ণা মুদি, গাজোল ব্লক মালদা।
১৪. আরতি মুদি, গাজোল ব্লক মালদা।
১৫. বাহাদুর মুদি, গাজোল ব্লক মালদা।
১৬. অসীম মার্ডি, গাজোল ব্লক মালদা।
১৭. মানিক মুদি, গাজোল ব্লক মালদা।
১৮. নগেন হাঁসদা, হবিবপুর ব্লক, মালদা।
১৯. অমূল্য হাঁসদা, হবিবপুর ব্লক, মালদা।
২০. বিমলা মাহালি, হবিবপুর ব্লক, মালদা।













বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ